ISSN 1605-7023

দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা

কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর ২০০৭

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক-১৪১৪

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ দেলোয়ার হোসেন	চেয়ারম্যান
মেছবাহ উল আলম	সদস্য
হোসাইন জামিল	সদস্য
মোঃ আশরাফ হোসেন	সদস্য
ফেরদৌস আখতার	সদস্য
পরাগ	সদস্য
ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান	সদস্য
ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক	সদস্য

সম্পাদক : বণিক গৌর সুন্দর

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক ১৪১৪
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 12th Year Issue, Kartik 1414
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ-১৪১৭/জুন-২০১০

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৪৫০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www.bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ -এর ঠিকানা

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মূদ্রণে : অরণ্য প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২২৪ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩৬৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

শিক্ষাকারিকুলামে নীতিশিক্ষার স্বরূপ অন্বেষা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ১
এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা কাঠামোর বিবর্তনধারা: একটি হালনাগাদ বিশ্লেষণ ৩৫
ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিমালা: আল-কোরআনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা ৬৭
মোঃ লুৎফর রহমান

সুশাসন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৯৯
শাহনাজ পারভীন

নারী উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমীক্ষা: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, ইস্যু ও সমস্যাসমূহ ১১১
মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

শিক্ষাকারিকুলামে নীতিশিক্ষার স্বরূপ অন্বেষা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

(An Inquiry into the Scope of Moral Education in Curriculum: Bangladesh Perspective)

এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া *

Abstract: Moral education helps students acquire good moral compass and set clear standards of behavior and thus enables them to practice ethical values such as justice, honesty, integrity, respect, responsibility, self-discipline and reliability, where we are lagging behind badly. We do not even seem to realize our social responsibilities and its impact on the society. This moral bankrupcy itself poses a barrier to achieving our national goals. Against this backdrop, introducing moral education throughout different levels of education in Bangladesh is a must.

The study is projected within the interpretive paradigm and is mainly evaluative in nature. Here a multi-method approach has been chosen which includes reviews of historical events connected to the foundation of moral education, and a comparative and evaluative design of the current national core curriculum as it outlines the goals of contemporary moral education. Specific attention is paid to the conception and understanding of moral values and the elements of democratic education in terms of the curricular rhetoric. This article is intended to present the essence of moral education in Bangladesh within a historical and philosophical context.

ভূমিকা

বিচিত্র সব সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা আজকাল– মূল্যবোধের সংকট, রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, মানবিক সংকট । আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব সংকটের প্রসূতি হচ্ছে নৈতিকতার সংকট । নৈতিক সংকট মানবিক বিকাশ তথা সামষ্টিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে । যেমন বণ্টনে অসমতা, বিবেচনায় অন্যায় এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি হলো নৈতিক সংকটের বিভিন্ন প্রকাশ । দার্শনিক ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ এই শতাব্দীর বড় বিপর্যয় হিসেবে নৈতিক বিপর্যয়ের কথা বলেন । নৈতিক বিপর্যয়ের উপসর্গসমূহ হলো: মানুষ কর্তৃক মানুষকে বঞ্চনা, শোষণ-নিপীড়ণ, অধিকার হরণ, জীবনের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন প্রভৃতি । মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা, অপরের জীবনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কষ্ট থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার শুভচেতনাই হলো নীতিবোধ । কোনোকিছু যদি নিয়ম মোতাবেক, আদর্শ মোতাবেক না হয় তাহলে যে বিচ্যুতি ঘটে সেটাই নৈতিক সংকট ।

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

আলোচ্য প্রবন্ধে নানা পরিপ্রেক্ষিত থেকে নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হবে; দিকনির্দশনামূলক আলোচনা করা হবে কিভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলামে নীতিশিক্ষাকে বাস্তবানুগ করা যায়।

দুই

২.১ কেন নীতিশিক্ষা প্রয়োজন?

নৈতিক সংকটের পরিব্যাপ্তি সমাজের বহুমাত্রিক ধারার সঙ্গে জড়িত। এ বিষয়গুলো জানার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন নৈতিকতা কী? দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুরই ভালো ফলাফল কিংবা উপযোগিতা দেখে সেসব কিছুর ওপর 'ভালো' শব্দটি প্রয়োগ করে থাকি। নীতিতাত্ত্বিক ম্যাকেঞ্জি মনে করেন নৈতিকতা হলো সর্বোচ্চ ভালোর দিকে পরিচালিত করে এমন কিছু।[১] ম্যাকেঞ্জির সংজ্ঞা থেকে নীতিবিদ্যার দুটি বিকল্প সংজ্ঞা দাঁড় করানো যেতে পারে: এক. নীতিবিদ্যা হল আইনসিদ্ধভাবে গৃহীত কোনো আচরণের বিদ্যা, এবং দুই. নীতিবিদ্যা সর্বোচ্চ মঙ্গল লাভের সহায়ক কোনো কিছুর বিদ্যা। আবার নৈতিকতার একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ ব্যতীত নৈতিক আচরণ করা সম্ভব নয়। মানুষের নৈতিক জীবনে বিশ্বাস আছে বলেই সে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিত বিশ্বাস করে। এসব নৈতিক ধারণা আমরা সামাজিক পরিবেশ থেকে লাভ করি এবং তা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে জানা এবং নীতিবিদ্যার চর্চা করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাই কারিকুলামে নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।[২]

নৈতিক সংকট একটি ব্যাধির মতো যা জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। নীতির সর্বজনীনকরণযোগ্যতাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে নৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। ধরা যাক, হত্যা করা বা প্রাণ বিনষ্ট করা অন্যায় তাহলে একই বাস্তবতায় সকল কালে, স্থানে এই নীতিটির কোনো ব্যতিক্রম থাকলে হবে না। এখন যদি ধরা হয় আমেরিকানরা হত্যা করতে পারবে, অন্য কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এ কাজটি করতে পারবে না। এরকম ব্যতিক্রম নৈতিক নিয়ম হতে পারে না। কোনো ব্যতিক্রমে যদি মানুষ হত্যা করার বিষয়টি নীতি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে দেখা যাবে এটি একটি নৈতিক মূল্যবোধের অংশ হয়ে দাঁড়াবে। আবার সমকালীন জীবনে বিদ্যমান ভোগবাদী সংস্কৃতিও নৈতিক সংকটকে ত্বরান্বিত করে থাকে। কারণ ভোগ যখন

---

১. Mackenjie, John. S., Manuel of Ethics, University Tutorial Press, London, 1964, Chap: Two.

Lilie, W., An Introduction to Ethics, Matheun, London, 1965, Chap 1.

একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সমষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে যায়। অর্থ বণ্টন ব্যবস্থায়, সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর প্রকাশ আরো উন্মোচিত হয়ে যায়। এভাবে সমষ্টির স্বার্থকে হেয় করার মাধ্যমে সামাজিক সংকটের আরেকটি মাত্রা চিহ্নিত হয়। অনেকসময় গোষ্ঠীবাদী চিন্তাচেতনাও নৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানবসেবা যদি কোনো গোষ্ঠীর সদস্য কিংবা অ-সদস্য হবার উপর নির্ভর করে তাহলে সেখানে প্রকৃত মানবতা অনুপস্থিত হিসেবে ধরতে হবে। বিপরীতক্রমে মানুষকে যদি মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, মনুষ্যত্ব যদি মুখ্য হয় তাহলে বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী, গোত্র মুখ্য করে তোলার দরকার নেই। মনুষ্যত্ববোধ বিবর্জিত জীবনাচরণ মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করছে। এটি নৈতিক সংকটের আরেকটি বাস্তবতা।

সমকালীন জীবনে সামাজিক সহিংসতা একটি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহিংসতার বিমূর্ত এবং মূর্ত ভিত্তি হলো আর্থ-সামাজিক সহিংসতা (socio-economic violence)। বেকারত্ব, অভাব, শোষণ, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক বৈষম্য হলো এর প্রকাশ। তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে এই সন্ত্রাস প্রভাবিত করেছে সামাজিক সন্ত্রাসকে। আমাদের বিপন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে একজন ছাত্র যখন দেখতে পায় তার দরিদ্র পিতার নাজুক অবস্থা, প্রত্যক্ষ করে তার পরিবারের অনিশ্চিয়তা, জাজ্বল্যমান হয় তার আগাম অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তখন কী করে সে মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করবে? কী করে সেই যুবক নিজের ও দেশের আগামী সুন্দরের কথা ভাববে? যাকে হুমড়ি খেতে হয় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো ন্যূনতম অধিকার সংরক্ষণে, বিভ্রান্ত হতে হয় অসামাজিক আদর্শ দ্বারা। প্রতিনিয়ত তাকে মুখোমুখি হতে হয় কোনো-না-কোনো ক্ষয়িষ্ণুতা, অবক্ষয় দ্বারা—সেই জনগোষ্ঠী কী করে মানবিকতার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবে প্রগতির পথে?

সমাজে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে আমরা যে অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখছি তা আমাদের সমাজদেহে অন্তর্নিহিত সঙ্কটেরই ফল। সমাজদেহে এমনিতে এটা সংক্রামিত হয়নি। মানবদেহের জন্য ভাইরাস যেমন 'ক্ষতিকর', সমাজদেহের জন্য 'নৈতিক সংকট' তেমনি। ভাইরাসের ন্যায় এটি বিনষ্ট করে দেয় সামাজিক সকল ভারসাম্য, ক্রিয়া ও তৎপরতা। ভাইরাস আমাদের দেহের অর্গানিক সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেয়। আর নৈতিক সংকট আমাদের সামাজিক প্রক্রিয়াকে বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু নৈতিক সংকটকে কী নির্মূল করা যায় না? নৈতিক সংকট যেহেতু সামাজিক ব্যাধি সেহেতু তার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক এতই নিবিড় যে গোটা শিক্ষা প্রক্রিয়ার লক্ষ্য যদি নীতিশিক্ষা না হয় তাহলে সে শিক্ষা কোনো কাজেই আসে না। সামগ্রিকভাবে আমরা যদি পঞ্চাশের দশকে পিছিয়ে থাকা রাষ্টসমূহের কথা ধরি (যেমন চীন, কোরিয়া, জাপান) তাহলে দেখা যাবে তাদের এগিয়ে আসার পেছনে শ্রম, মেধা, একাগ্রতা সর্বোপরি নৈতিক প্রতিশ্রুতি ভূমিকা রেখেছিল। উন্নয়নের সঙ্গে নৈতিকতার ভূমিকা রয়েছে। কারণ উন্নয়ন যে সামগ্রিকতাকে বোঝায় তা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়। এর সঙ্গে রয়েছে নাগরিকের সুস্থ, নিরাপদ এবং মানব উন্নয়ন সূচকের গড়পরতার মধ্যে জীবন-যাপন করার প্রতিশ্রুতি। জাপানে যে উন্নয়নের গতিধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার পেছনেও এই নীতিবোধ চূড়ান্তভাবে কাজ করেছে। অমর্ত্য কুমার সেন এই নীতিবোধের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকের বিশেষত্বকে নাম দিয়েছেন 'জাপানী নীতিবোধ' (Japanese Ethos)[৩]। এর মধ্যে কতগুলো উপদান রয়েছে: কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা, দল বা গ্রুপের প্রতি বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্বজ্ঞান। সুতরাং প্রচলিত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে আত্মস্বার্থভিত্তিক প্রেষণা রয়েছে তা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। প্রচলিত আত্মস্বার্থবাদী প্রেষণার স্থলে 'স্বতন্ত্র প্যারাডাইম' গড়ে তুলতে হবে। এই স্বতন্ত্র প্যারাডাইমে রয়েছে এক দ্বৈততা। দ্বৈততার এক প্রান্তে রয়েছে 'ব্যক্তির স্বাধীন সক্রিয় ভূমিকা' অন্যটি হচ্ছে 'ব্যক্তির নিজস্ব ভালো অবস্থা'। ব্যক্তি যখন প্রথম প্রান্তে থাকে তখন সে শুধু বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির প্রেষণাই করে না, বরং সামাজিক, পারিবারিক, দলীয় প্রেষণা, আদর্শিক, মূল্যবোধগত ধারাও তার মধ্যে কাজ করে। ব্যক্তির দ্বিতীয় অবস্থাটি একান্তই ব্যক্তির আত্মত্যাগ এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কিংবা রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নৈতিক প্রতিশ্রুতি একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

একারণেই বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহ তাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় নীতিশিক্ষার ধারণাটিকে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং মালয়েশিয়া—তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে কাজ করেছে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের জোয়ারে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে 'নীতিশিক্ষা'। নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, মানবিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি করাকে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরা মনে করেন গোটা শিক্ষাকাঠামোর লক্ষ্য শুধু দক্ষ নাগরিকশ্রেণী সৃষ্টি করা নয়, বরং নৈতিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ একটি নাগরিক শ্রেণী তৈরী করা এ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

---

[৩] Sen, A.K., On Economics and Ethics, Basil Blackwel, London, 1987.

তিন

৩.১ বাংলাদেশে নীতিশিক্ষার বিবর্তন

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে ধারা তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতির একটি আন্তঃসর্ম্পক রয়েছে। আমরা যদি সামাজিক জীবনে বিদ্যমান দুর্নীতির মূল স্বরূপটি বিশ্লেষণ করি তবেই এর সত্যটি বের হয়ে আসবে। আমাদের দুর্নীতির মূল নিয়ামকসমূহ কী? - এ প্রশ্নের উত্তর উন্মুক্ত করলে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়। বিগত সময়গুলোর দিকে তাকালেও এই বিষয়টির সত্যতা আরো প্রমাণিত হয়। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থানরত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক। দুর্নীতির উৎস হিসেবে সেখানে যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী। অন্যান্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথাও যদি আমরা বিবেচনা করি। যেমন ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, পেশাজীবী সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটি বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়, মনের ভেতর লুক্কায়িত মন্দ ও অশুভ চিন্তাকে বিদূরিত করে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্গত মননকে আলোকিত করে, সততার দিকে, নৈতিকতার দিকে নিয়ে যায়। এসবের ভেতর দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধ। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা লক্ষ্য করছি শিক্ষা তার এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় অধিক শিক্ষিত হবার মধ্য দিয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী হচ্ছে, সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা জনগণকে ধোকা দিচ্ছে, রাষ্টের সম্পদ নিজেদের ভোগ-বিলাসে লাগাচ্ছে। এভাবে অনেক শিক্ষিতজনই দুর্নীতির নিয়ামক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখছে। বলা যায়, আমাদের দেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির মধ্যে নীতি-নৈতিকতা জাগিয়ে তুলতে যথার্থ অর্থেই ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য এটাও সত্য, আমাদের শিক্ষা থেকে নীতি-নৈতিকতার এই বিচ্যুতি একদিনের কোনো ঘটনা নয়। আমরা যদি অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শিক্ষা-কাঠামোর মধ্য দিয়ে এই নীতিহীনতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার অনুপ্রবেশ করেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারত উপমাহাদেশে এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেন। ভারতে কিভাবে তাদের শাসন কায়েম করে রাখা যায় সেই লক্ষ্যে একটি অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করাই ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। ভারতে ইংরেজী বলবে শুধু শাসক শ্রেণীর লোকেরা, যেসব ভারতীয়গণ সরকার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কেবল তাদের জন্য ইংরেজি ভাষা প্রযোজ্য। সর্বোপরি বৃটিশগণ ভারতে শিক্ষা প্রচলন করেছিল স্রেফ একটি করণিক

শ্রেণী সৃষ্টি করার জন্য। এভাবেই উনিশ শতক থেকে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় 'চাকুরি অর্জন করার কৌশল' হিসেবে। আবার স্বাধীন ভারতে আমরা যখন স্বতন্ত্র ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে শুরু করি তখনও শিক্ষা বলতে বিদেশি টেকনোলজি, বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দেই। কিন্তু শিক্ষা প্রদান এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আমাদের আর্থ-সামাজিক সংকটের বিষয়টি ভুলে যাই। একই কারণে আমাদের প্রাচীন যেসব জ্ঞান-কৌশল আছে সেগুলো আমরা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছি না।

বঙ্গদেশে ৮০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভক্তিবাদ এবং সূফিবাদী জীবনাচরণে নীতিশিক্ষার একটি ধারা প্রচলিত ছিল। এখানে ঈশ্বরের একত্ববাদী ধারণাকে ধর্মীয় জীবনের মূল হিসাবে ধরা হতো। তারা মনে করতেন ঈশ্বরের উপাসনার ভেতর দিয়ে আমরা মূলত মানবতারই সেবা করছি। ধর্মনিরেপক্ষ চিন্তা-চেতনার জায়গা থেকে সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণ করার লক্ষ্য ছিলো তাদের লক্ষ্য। তারা মনে করত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার চেয়ে একান্ত মনে ঈশ্বরের আরাধনা অনেক উত্তম। মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীকরণ রয়েছে, মানুষ থেকে মানুষকে আলাদা করার কুসংস্কার রয়েছে তা পরিহার করতে হবে। তাদের এই দার্শনিক উদ্দীপনাটি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রত্যেকটি পর্যায়কে প্রভাবিত করেছিল। তাদের চিন্তা-চেতনার এই মানবিক ধারাটি লোকায়ত জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল দীর্ঘদিন। মানবিক আদর্শ এবং বিশ্বাস লোকয়ত জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে চর্চা করা হতো। এর পরের ইতিহাস ঔপনিবেশিক কালপর্বের। এখানে ঔপনিবেশিক শক্তি তার প্রয়োজনে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে—অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা নৈতিক উন্নয়ন ততোটা গুরুত্ব পায় নি। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ধারার শিক্ষাচিন্তায় নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যভুক্ত করার পরিকল্পনা অতীব জরুরী। প্রশ্ন হলো, শিক্ষা-পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত নীতিশিক্ষার স্বরূপ কেমন হবে? আমরা তত্ত্বগতভাবে জানি নীতিশিক্ষা হলো মানুষের আচরণের ঔচিত্য ও অনৈচিত্য সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কিন্তু সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় নীতিশিক্ষা হলো মানবিকতা, সাধুতা, কল্যাণধর্মিতা ও মানসিক উৎকর্ষ -এর সমন্বয়েই গড়ে উঠা এক ধরনের চেতনাবোধ। এই চেতনাবোধের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৩.২ বাংলাদেশে শিক্ষা কারিকুলামে নীতিশিক্ষার স্বরূপ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শিক্ষানীতি প্রণিত হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষানীতি যুগোপযোগী শিক্ষাধারা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের

পরিকল্পনার কথাও এসব শিক্ষানীতিতে জোরেসোরে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু জাতির উন্নয়নে 'শ্রম, মেধা ও নৈতিকতা' যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে বিষয়টি এখানে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। মেধাকে কাজে লাগানোর জন্য একজন নাগরিকের যে নৈতিক শক্তি থাকা প্রয়োজন সে বিষয় এসব শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব পায়নি। বস্তুত শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার জন্য আধুনিক মনন ও রুচিসম্পন্ন নাগরিক প্রয়োজন। আর সেরকম রুচি ও মনন-বিশিষ্ট নাগরিকশ্রেণী গড়ে তোলার জন্যই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন।

৩.২ (১) বাংলাদেশের শিক্ষানীতি: নীতিশিক্ষার অবস্থান

ক. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন ৭২' এর সংবিধান এবং স্বাধীন দেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তাবনা ছিল। এ রিপোর্টে শিক্ষার কাঠামো বিন্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট আলোচনা তাতে অনুপস্থিত[৪]।

ছক ১ : খুদা কমিশনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : নৈতিক গুণাবলী

শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য	নৈতিক গুণাবলীর স্বরূপ
দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব	ক. শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেমের মূলমন্ত্র হিসাবে জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম করে তোলা। খ. শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার নিজের দেশকে আপন করে নিতে শিখবে। মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণচেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধানের চার মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ শিক্ষার্থীর চেতনায় জাগ্রত করতে হবে। এজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে যেন নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়:

৪ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সম্পাদনায় বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি, নভেম্বর, ২০০৬।

	● ব্যক্তি ও গোষ্ঠীচেতনার উর্ধ্বে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত একই পাঠক্রমে জাতীয়তাবোধ সংবলিত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। ● সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উভয় দিক থেকে জনগণের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ এবং অধিকারবোধের সঙ্গে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা উচিত। জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সামাজিক কল্যাণ এবং জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা। ● ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করা। এজন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক উৎকর্ষ বিকাশের ব্যবস্থা শিক্ষায় থাকতে হবে।

ছক ২ : শিক্ষায় নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	নৈতিক গুণাবলীর স্বরূপ
মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব	ক. জাতীয় কল্যাণকে ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা থাকতে হবে। সেই প্রেরণার উৎস হবে মানবতা। খ. মানুষের প্রতি মানুষের বিবেচনা হবে প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মৈত্রী-বোধসমৃদ্ধ। শিক্ষার লক্ষ্যই হওয়া উচিত মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা প্রদর্শন করার মতো বোধ ও উপলব্ধি অর্জন করা।
মূল্যবোধ অর্জন	ক. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শুধু নৈতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করলেই হবে না। কাজে কর্মে, চিন্তায়, আচরণে কীভাবে শিক্ষার্থীদের সততার দিকে নিয়ে যায় তাই ছিল মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য।

	খ. শিক্ষার্থীকে নির্লোভ ও পরোপকারী মানসিকতায় গড়ে তুলতে হবে। নির্লোভ হবার কারণে সে বিত্তশালী হবার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকবে না। আর পরোপকারী মানসিকতা শিক্ষার্থীকে মানবতাবাদী করে তুলবে। গ. শিক্ষার্থীকে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করবে। এই পৃথকীকরণের ফলে সে বুঝতে পারবে কোন কাজটির প্রতি সমর্থন দিতে হবে, আর কোনটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ঘ. এই রিপোর্টে শিক্ষকদের উচ্চ নৈতিক গুণাবলী অর্জনের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ শিক্ষকদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষাদানের সঙ্গে তাদের সততা, নিরপেক্ষতা এবং দেশের প্রতি নির্মোহ প্রতিশ্রুতিও প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকতায় উচ্চ নৈতিক মান সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকদেরও সৎ ও উদ্যেমী করার প্রয়োজন রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, খুদা কমিশনের গোটা রিপোর্টে আলাদা করে নৈতিক শিক্ষার প্রস্তাবনা নেই। কিন্তু রিপোর্টের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের কথা বলা হয়েছে।

খ. ১৯৭৫ সালের পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণপন্থি রাজনিতিকগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এর ভেতর দিয়ে ৭২ এর সংবিধান থেকে জাতীয় মূল চারনীতির মৌলিক প্রতিশ্রুতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'সমাজতন্ত্র' হারিয়ে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে জায়গা করে নিয়েছে 'গোড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা', আর সমাজতন্ত্রের স্থলে ব্যক্তিমালিকানা ও শ্রেণীবৈষম্যের মতো উপাদানসমূহ। এর অভিঘাত আমরা লক্ষ করি শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও। ফলে খুদা কমিশন রিপোর্টে গুণগত মানসম্পন্ন যে আধুনিক শিক্ষার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় তা আর আলোর মুখ দেখতে পায়নি। ১৯৭৪ সালের পর শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন, পরিষদ এবং কমিটি, গঠন করা হয়। নীতিশিক্ষা সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকের প্রতিবেদনে অভিন্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষেপে বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যাক:

ছক-৩ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বিভিন্ন কমিশন/কমিটির রিপোর্টে নীতিশিক্ষা

কমিশন বা কমিটির নাম	নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তব্য
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৬	১. ধর্মীয় বোধ-বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিবোধ, মূল্যবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করার জন্য তাদের মধ্যে ধর্মীয়বোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত করানো উচিত।
অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ), ১৯৭৯	বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত নানামুখী শিক্ষা ধারাকে একীভূত করার প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে পারে এবং সকল ধর্মের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কারণ হিসাবে দুটি বিষয়ের প্রস্তাব করা হয় : ১. সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মবিশ্বাস বিশেষ করে বিশেষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অকুণ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো। ২. ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই এর লক্ষ্য। *মন্তব্য : অথচ ১৯৭২ সালে সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে : শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত রাখতে হবে।*
বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজউদ্দিন শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট), ১৯৮৮	এখানে দেখানো হয়েছে ধর্মশিক্ষা ও নীতিবোধ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিষ্টাচার, আদর্শিক মূল্যবোধ এবং নীতিবোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও বিস্তার ঘটাতে হবে।
'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' ১৯৯৭ (অধ্যাপক এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি)।	এই কমিটির প্রতিশ্রুতি ছিল কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা-কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করা । এ কমিটি শিক্ষানীতি লক্ষ্য হিসাবে বলা হয় : "ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপের চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। উচ্চশিক্ষাকেও হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সম্পূর্ণ সমাজমুখী, উদারনৈতিক, মানবমুখী এবং প্রগতিশীল।* **দৈনিক সংবাদ, ১৩,০৭,১৯৯৭*

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০'	শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনায় নৈতিক গুণাবলী অর্জন করাকে নীতিশিক্ষার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে চারিত্রিক গুণাবলী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে। কিভাবে নীতিশিক্ষা অর্জন করা যায়? এরকম বিবেচনায় এ রিপোর্টের 'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' অনুচ্ছেদে বলা হয় : "শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও আচরণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।... ধর্ম-শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।" এ রিপোর্টের 'অধ্যায়-৭' এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অধ্যায়ে বলা হয় : "... ধর্ম শিক্ষা যাতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া আবশ্যক"

প্রত্যেকটি শিক্ষানীতির লক্ষ্য থাকে মানবীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। ব্যক্তিক এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রত্যেকটি স্তরে এসবের পরিচর্যা করা জরুরী। উপর্যুক্ত শিক্ষানীতির প্রত্যেকটিতে দাবি করা হয় ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায়। নীতিশিক্ষা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে এসব রিপোর্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা দাবি করেন ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনই হলো নৈতিক চরিত্র গঠন। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে তারা বলেন: ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা অভিন্ন। উভয়েরই লক্ষ্য হলো নীতিবোধ, চরিত্র গঠন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। উপস্থাপিত শিক্ষানীতিতে [কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ব্যতীত] নীতিশিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রত্যেকটি শিক্ষা রিপোর্ট 'ধর্ম ও নীতিশিক্ষা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়: "শিক্ষার্থীর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য (কিংবা নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য) ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে"। এরকমভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিটি রিপোর্টে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিতর্কিতভাবে।

চার

৪. নীতিশিক্ষা কী ধর্মীয় শিক্ষা?

বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষাকে ধর্মীয়শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। ধর্মকে বিবেচনা করা হয় শিক্ষারই অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে। প্রশ্ন হতে পারে ধর্মীয়

শিক্ষা কি নৈতিক শিক্ষা বহির্ভূত? অনেক তাত্ত্বিকগণ অবশ্য দাবি করেন[৫] ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। ধর্ম মানুষকে কিভাবে চিন্তা ও বিশ্বাস করতে হয় সেই সমস্যার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আর কিভাবে জীবন-যাপন করতে হয়, কিভাবে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যবিন্দু নির্ধারণ করতে হয় তা নির্ধারণে নৈতিকতা ভূমিকা রেখে থাকে। ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে ইজেতগোভিচ বলেন: ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর নৈতিকতা কর্ম দ্বারা প্রলুব্ধ। সুতরাং শিক্ষার উপর ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাবকে যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে বলতে হবে: ধর্মীয় শিক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাস-নির্ভর, অন্যভাবে বলা যায় নৈতিকতা হল জাগতিক জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে বিদ্যমান এই দার্শনিক পার্থক্য রেখে পরস্পরের মধ্যে বাস্তবভিত্তিক কোনো সেতুবন্ধন তৈরি করা যায় না।

নীতিশিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় অবিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি আমাদের জাতিগত-চেতনা-বিরুদ্ধ বলা যায়। কারণ আমাদের জাতীগত ঐতিহ্য তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ চেতনা থেকে। আমাদের সমাজ থেকে উত্থিত কবিয়াল, সাধু, সন্নাসী, বাউল, ফকির, মুর্শিদ পীর বিভিন্ন গোত্র বর্ণের মানুষের জীবন দর্শনেরই সমন্বিতরূপ হিসাবে বাঙ্গালি-বোধ ও চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৪৮ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন: "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকার জো-টি নেই"। এরকম বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমাদের বাঙ্গালিয়ানা উদ্ভাসিত হয়েছিল। বাঙ্গালীর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমবাদ যা আমাদেরকে দিয়েছে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী ঐতিহ্য। বাঙ্গালী জীবনদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ-তোষণের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের প্রেমবাদ বা ভক্তিবাদ ছিল এক সোচ্চার দ্রোহ। বৈষ্ণবদের কাছে প্রেম বা ভক্তি ছিল 'সর্বাত্মক মিলনের' প্রতিচিহ্ন। এই প্রেমবাদের জোড়েই বর্ণাশ্রিত ধর্মের ধারক-বাহক ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবদের ঘোষণা ছিল– "বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে/ বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে"। এরকম অভিব্যক্তি কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়, বরং এ হল মনুষ্যত্বের দর্শন। এরকম ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ও মনুষ্যত্বেবোধের ভেতর দিয়ে 'বাঙ্গালীর জাতিসত্তা' সুসংগঠিত হয়েছিল। বস্তুত 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' নামক প্লাটফরমে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষ এক

---

৫ Russell, B. Education and Social Order , chap. Religion in Education, London, : rpt. 1977, p.73.

হয়েছিল। সুতরাং আমাদের শিক্ষানীতিতে ধর্ম-আচ্ছন্ন যে শিক্ষার প্রস্তাব করা হচ্ছে তা আমাদের জাতিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই শিক্ষা পরিকল্পনায় জাতিগত ঐতিহ্যের ধারাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। পাশাপাশি ধর্ম এবং নৈতিকতা যে এক ও অভিন্ন বিষয় নয় তা স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। দার্শনিকভাবেই আমাদের স্বীকার করতে হবে ধর্ম ও নৈতিকতা এক বিষয় নয়। যদিও ধর্মতাত্ত্বিক নীতিবিদগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যকার পারস্পরিক বিষয়টিকে মেনে নিয়ে নৈতিক আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু এ দুটি প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন।

মার্কস সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার নিরিখে দেখিয়েছেন ধর্ম মানুষকে জগত সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তোলে। নিস্পৃহ জীবন পার্থিব ভোগসুখ অপেক্ষা নির্ভোগ জীবনকেই উৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। পার্থিব ভোগসুখ নয়, আত্মাকে নির্লোভ ও ত্যাগের অনুশীলনের মধ্য রেখেই কেবল পরম মুক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং ধর্ম মানুষকে পরমমুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত রেখে জগত সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। আর নৈরাশ্যবাদী মানব চরিত্রের ফাঁক-ফোকড়েই শোষণ টিকে থাকে। মার্কস শোষণের এই জায়গাটি সনাক্ত করেছেন। সনাক্তকরণের মাধ্যমে তা থেকে পরিত্রাণের পন্থাও নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে মার্কস তাঁর থিসিস অন ফয়েরবাখের অষ্টম থিসিসে বলেন, "সামাজিক জীবন মূলত ব্যবহারিক। যেসব রহস্য তত্ত্বকে অতীন্দ্রিয়বাদের পথে বিভ্রান্ত করে সেইসব রহস্যেরই যুক্তিসিদ্ধ সমাধান পাওয়া যায় মানবিক ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে এবং তা উপলব্ধির মধ্যে"।[৬] ধর্ম ও ভাববাদ ব্যক্তিকে নিস্প্রভ করে তোলে, এই নিস্প্রভতার সুযোগটিই গ্রহণ করে শোষকশ্রেণী। মার্কস তাই মানুষকে জাগতিক জীবন সম্পর্কে উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অবাস্তবতা থেকে বাস্তবতায়, ধ্যানের জগত থেকে সুস্থ, কর্মবাদী জীবনের প্রয়াসী হবেন। মার্কস মনে করেন ঐশী সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস অনয়নের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি নিজেকে পরিণত করে জগতবিমুখ, নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তিত্বে। নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি নিজের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ হিসাবে ভাগ্যের লিখনকে দায়ী করেন; ভুলে যান সামাজিক শোষণের সমাজতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে। কিন্তু মার্কস আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী নৈতিকতাকে সমর্থন করেননি। তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূল কথাই হল মানুষকে মানবিক বোধ ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। মানবসৃষ্ট কোনো কানুন যেন মানবসত্তাকে পদদলিত না করে, মানুষের অধিকার যেন মানুষ দ্বারা বিঘ্নিত না হয় সেদিকটির প্রতি মানুষের চিন্তাকে নিবিষ্ট করতে প্রলুব্ধ করেন। এই দার্শনিক চিন্তার উপর ভর করেই মানুষ আত্মসর্বস্ব ইন্দ্রিয়সুখকে কাম্য মনে না করে, মানবকল্যাণের

৬ Marx, Karl, ... Thesis on Feuarbach

মহত্তর লক্ষ্যকে শ্রেয় মনে করে সামনে এগিয়ে যাবে। এজন্য ধর্মাশ্রয়ী নৈতিকতা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ মানবতাবাদী নৈতিকতাই পারে সামাজিক বৈষম্যের স্থলে সমতাবাদী বিধান প্রতিষ্ঠা করতে।

রাসেলের দাবি হলো ধর্মীয় শিক্ষা একদিকে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির মত সদগুণকে খাটো করে দেখে, অন্যদিকে বুদ্ধিগত নিরপেক্ষতার মত গুণকে খারাপ কিছু বলে গণ্য করে থাকে। যেমন বির্বতনবাদকে অবৈধ ঘোষণা কর হয়। অন্যদিকে, ধর্মীয় শিক্ষা যদি সর্বজনীনভাবে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হত তাহলে ধর্মে-ধর্মে, কিংবা একটি ধর্ম-ভাবাপন্ন জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য একটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর বিরোধ বাধত না। ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বড় ধরনের এই আপত্তিগুলো রাসেল তাঁর *Education and Social Order* গ্রন্থের Religion in Education অধ্যায়ে জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। রাসেল বলেন[৭]

— ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে রক্ষণশীলতার সৃষ্টি করে। এই রক্ষণশীলতার কারণে ব্যক্তি সনাতন সকল অকল্যাণকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। এর উপর ভর করে তারা নরহত্যাকেও ধার্মিকতার পর্যায় ফেলে থাকে। শুধু তাই নয় পুঁজিবাদী শোষণকেও তারা বৈধতা দিয়ে থাকে। দুই. ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎস হল ভীতি, আর ধর্মতাত্ত্বিকগণ বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে এই ভীতিসমূহ দূর করা উচিত নয়। আর ধর্ম-পুরোহীতগণ এই ভীতিকে কাজে লাগিয়ে মানব মর্যাদাকে অবমাননা করে থাকে। তিন. ধর্ম ইহকাল অপেক্ষা পরকালের উপর গুরুত্বারোপ করে মানুষের দৃষ্টিকে জগৎবিমুখ করে থাকে। প্রকারান্তরে এই বিমুখতা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে শোষণ-ত্রাসণ থেকে সরিয়ে পরকালের দিকে নিবদ্ধ করে থাকে। চার. ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে থাকে। সুতরাং এসকল আপত্তির প্রেক্ষাপটে বলা যায় ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সামর্থ্য নষ্ট করে দেয়। আপতিক সত্য সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করার দায়িত্ব ধর্ম গ্রহণ করে থাকে। এ কারণে ধর্মশিক্ষাকে নীতিশিক্ষার পরিপূরক ভাবার কোনো কারণ নেই। নীতিশিক্ষা একটি কৌশল, অনুশীলন ও অধ্যায়ন করার একটি বিদ্যা। কলাবিদ্যা, শিল্পকলা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিদ্যা তথা প্রাণবিদ্যা যেমন শিখতে হয়, তেমনি নীতিশিক্ষা পাঠক্রমের মাধ্যমে প্রক্রিয়ামাফিক ভাবনার ভেতর দিয়ে শিখতে হয়। এই শেখার পক্রিয়ায় পদ্ধতি, কৌশল, কারিকুলাম সবই বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অহরণে সাহায্য করতে পারে ধর্মশিক্ষা। কিন্তু নীতিশিক্ষা বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে

---

৭ Russell, B. Education and Social Order , chap. Religion in Education, London, : rpt. 1977, p.73.

পারে। এজন্য ধর্মশিক্ষার আওতায় নয়, বরং আলাদা করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নীতিশিক্ষার প্রচলন থাকা উচিত।

প্রশ্ন হলো শিক্ষা কি ধর্মহীন হবে? তাও নয়। বরং কীভাবে একটি সুশীল, সভ্য এবং সংস্থিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় তাই হলো এর লক্ষ্য। সুন্দর এবং সৌম্য সমাজ যদি স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে কেন আমরা ঠুন্‌কো দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ বেছে নেব? কেনই-বা মানুষকে ঠেলে দেব অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে। এসব সঙ্কটের জন্যই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতিশিক্ষার প্রস্তাব করছি তা ধর্মীয় নৈতিকতার আদলে হবে না। বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকতা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগী করে তোলাই এর লক্ষ্য। নীতিশিক্ষার একটি দিক হলো সত্যকে জীবনধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা, আর এর নান্দনিক দিকটি হলো জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে মানুষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করা। সকল কিছুর মূলে এক কথায় 'মানবকল্যাণ'। মানবকল্যাণ-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মও তাই যথার্থ কর্ম হতে পারে না। সুতরাং নৈতিকতার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস রয়েছে। যদিও নৈতিকতার আলোচনার ধরন একেবারে 'Normative' এর ফলেই আমরা সত্যের প্রতি দৃঢ় ভালবাসার সাহায্যে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনকে বিকশিত করতে পারি, সমাধান করতে পারি সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটসমূহকে। পাশাপাশি স্বাধীনভাবে উত্থাপিত করতে পারি বিশ্লেষণ করতে পারি অশুভ কিংবা অকল্যাণ সম্পর্কিত সঙ্কটকে। আবার নৈতিকতার নান্দনিক দিক যেহেতু 'সত্যাশ্রয়ী সুন্দর' ও 'সত্যাশ্রয়ী কল্যাণ' তাই এদিক থেকেও আমরা পৌঁছতে পারি জীবনের গভীরতর প্রত্যাশায়। সুতরাং নীতিশিক্ষা কোনোপ্রকার ধর্মীয় শিক্ষা না-হলেও যেমন সমস্যা নেই, তেমনি এ নিয়ে দার্শনিক বিতর্কে উপনীত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। যদি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নীতিশিক্ষা হয় বৈজ্ঞানিক এবং নান্দনিক।

পাঁচ

৫.১ কারিকুলামে নীতিশিক্ষা: ধারণাগত অবকাঠামো

নীতিশিক্ষায় যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠার ডায়াগ্রামে দেখানো হলো :

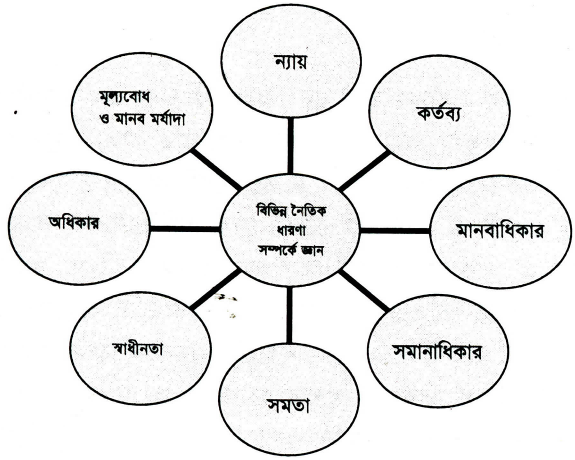

ডায়াগ্রাম ১ : নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান

কারিকুলামে নীতিশিক্ষাকে কিভাবে বিন্যস্ত করা হবে? এক্ষেত্রে আমরা একটি ঊর্ধ্বক্রম মডেল অনুসরণ করতে পারি। এখানে উপাদান হিসাবে বিবেচিত হবে: ১. নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা, ২. ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক অবস্থান, ৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ৪. নীতিশিক্ষা । এই কয়টি উপাদানের সাহায্যে মূল কারিকুলাম কাঠামো গঠন করা যায়। নিচের ডায়গ্রামটি লক্ষ্য করা যাক :

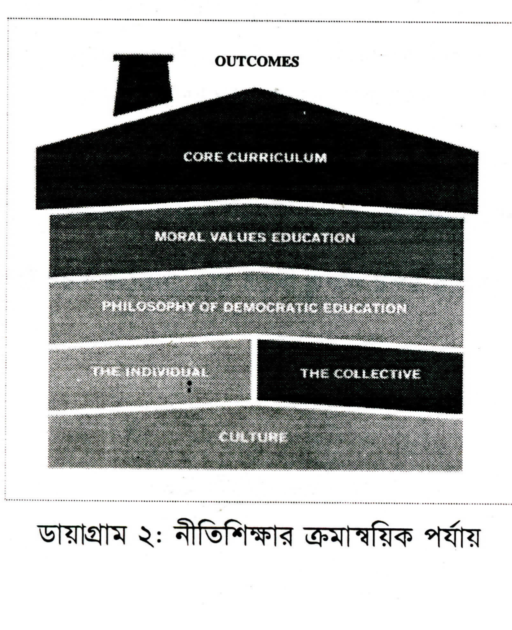

ডায়াগ্রাম ২: নীতিশিক্ষার ক্রমান্বয়িক পর্যায়

ক. সংস্কৃতি : নীতিশিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐহিত্য বোধ ও বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা যাবে না। উপর্যুক্ত মডেলে আমরা লক্ষ্য করছি কারিকুলামের ধারণাগত ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি হলো তার মূল ভিত্তি। সংস্কৃতি আবার ব্যক্তির নীতিবোধের দিক থেকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমও হতে পারে। সংস্কৃতির কিছু উপদান রয়েছে, এসব উপাদান আবার ব্যক্তি এবং সমাজের নৈতিক চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম কতগুলো নৈতিক উপাদানের কথা ধরা যাক: বস্তুগত অবধারণ (statements of facts), মূল্যাবধারণ (value statement), আদর্শ (norms), নৈতিক (moral), তাত্ত্বিক (theoretical), আইনগত (legal), সামাজিক (social) এবং নান্দনিক আদর্শসমূহ (aesthetic norms) ইত্যাদি মূলত সংস্কৃতিরই উপাদান যা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শেখানো হয়ে থাকে। যেমন, দার্শনিক জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি আদর্শ : 'সত্য (truth) সুন্দর (beauty), ও মঙ্গল (good)' শিক্ষা দেয়া হয়। আবার, এই তিনটি আদর্শ ব্যতীত সাংস্কৃতিক অবয়ব চিন্তা করা যায় না। সুতরাং সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং শিক্ষা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। এই দুটি উপাদানের সঙ্গে আবার নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীকে উক্ত দুটি উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ছাড়া নীতিশিক্ষাকে পরিপূর্ণ করা যায় না।

খ. ব্যক্তি ও সমষ্টি: নৈতিকতার আরেকটি লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমষ্টি-স্বার্থ এই দুইয়ের মধ্যে যদি সংহতিপূর্ণ সেতুবন্ধন সৃষ্টি না হয় তবেই সামাজিক সংঘাত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সামাজিক সংঘাত ও মানবীয় সংকট যেন জনজীবনকে অস্থিতিশীল না করে তোলে সে কারণেই উভয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকা উচিত। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি হলো সমাজজীবনের একক, এককই যদি কোনো কাঠামোর মধ্যে অনুপস্থিত থাকে সেখানে কোনো ব্যবস্থায়ই চলমান হতে পারে না।

গ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আমরা নীতিশিক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে এটি কয়েকটি নৈতিক ধারণার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে: সমতা (equality), স্বাধীনতা (liberty) ও মানব মর্যাদা (human dignity)। রাষ্ট্রতাত্ত্বিক হ্যানডারসন (১৯৪৭) গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে দুটি মূল্যবোধের কথা বলেন : একটি হলো অসীম মূল্যবোধ, অন্যটি হলো মানব-ব্যক্তিত্ব। এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মানুষ সামগ্রিক কল্যাণকে ত্বরান্বিত করে থাকে। সুতরাং, গণতন্ত্র একটি সামগ্রিক জীবনবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। গণতন্ত্র নৈতিক বোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক শিক্ষা, নৈতিকতা এবং সমতা একইসঙ্গে সহাবস্থান করে। নীতিশিক্ষা গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে সম্ভব করে

তোলে। এজন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতার কতগুলো অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষায় নৈতিক বাস্তবতার (ethical dimension) কয়েকটি উপাদান হল ১. ব্যক্তির মর্যাদা (dignity of the individual), ২. সমতাবাদ (equalitarianism) ৩. ভ্রাতৃত্ব (brotherhood), ৪.স্বাধীনতা (freedom), ৫. মানুষের শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস (faith in the educability of man), ৬. ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া (co-operation to all individuals), ৭. গোষ্ঠী-কল্যাণে কোনো ব্যক্তির অবদানকে প্রশংসা করা (appreciation of the contribution of individuals to group welfare), ৮.চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা (character and intelligence) এবং ৯. শুনাগরিকত্ব (good citizenship)।

শিক্ষাকাঠামোর উপর্যুক্ত শর্তসমূহ একটি চক্রাকার আবর্তে সম্পর্কিত। জনগণের সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, জগণের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া, পরস্পরের মধ্যে অভিমত আদান-প্রদান, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য এবং মূল্যবোধে অংশগ্রহণ এসবই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অংশ। এসব উপাদানের সম্পর্ক-বিন্যাসকে নিম্নের ডায়াগ্রামে দেখানো হলো:

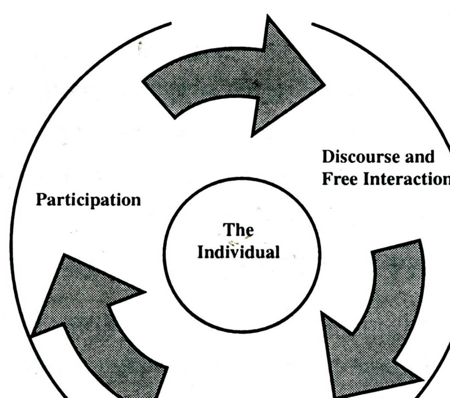

ডায়াগ্রাম ৩ : নীতিশিক্ষায় বিদ্যমান উপাদান

উপর্যুক্ত ডায়াগ্রামেও আমরা লক্ষ্য করছি কারিকুলামে বিদ্যমান নীতিশিক্ষায় মূল্যবোধের একটি গুরুত্ব রয়েছে। আমরা যদি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখা যাবে 'শিক্ষা' এমন এক বিকাশমান প্রক্রিয়া যা চিন্তার

অবিরাম ও গতিশীল ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি সৃষ্টির সহায়ক হিসেবেও শিক্ষা কাজ করে থাকে। বিশেষ করে একজনের জীবন নির্বাহ এবং আত্মার মানবিক উৎকর্ষ বিধানের কাজটিও শিক্ষা করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও আদর্শ সৃষ্টির কাজটিও সম্পন্ন হয়ে থাকে। চিত্রে দেখা যাক:

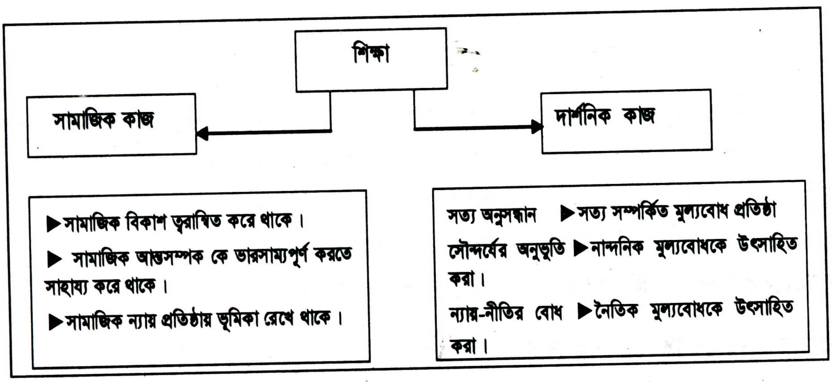

ডায়াগ্রাম ৪ : শিক্ষার সামাজিক ও দার্শনিক কাজ

ডায়াগ্রাম ৪-এ আমরা দেখাতে চেয়েছি শিক্ষা সামাজিক ও দার্শনিক দিক থেকে কার্যত মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। আবার এ দুটি দিকের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধকে উৎকর্ষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষা তিন ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে: ক. সামাজিক মূল্যবোধ, খ. দার্শনিক মূল্যবোধ ও গ. মানবিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ ও দার্শনিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। দার্শনিক মূল্যবোধে রয়েছে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক মূল্যবোধে রয়েছে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের অনুভূতি সৃষ্টি করা। বিষয়টি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে:

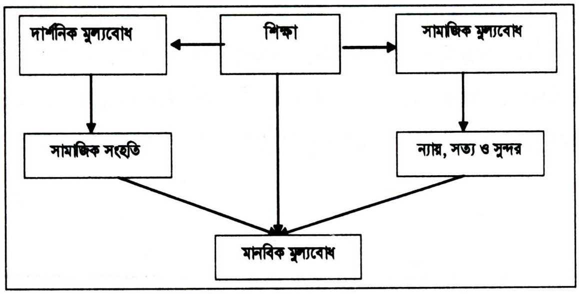

ডায়াগ্রাম ৫ : শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক

উপর্যুক্ত ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা মূল্যবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রশ্ন হতে পারে, মূল্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি বা উপলব্ধি-ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিক্ষা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তাত্ত্বিকগণ মনে করেন শিক্ষার কতগুলো উপাদান রয়েছে যা আবার মূল্যবোধেরও উপাদান। উভয়ের মধ্যে এই আন্তঃসম্পর্ক প্রমাণ করে শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। বিষয়গুলো আলোচনা করা যাক:

জীবনের জন্য যে শিক্ষা সেই শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে রয়েছে : সনাক্তকরণ (identification), ব্যাখ্যা (interpretation), বিশ্লেষণ (analysis), মূল্যবোধ মূল্যায়ন করার দক্ষতা (capacity of evaluation of values)। এই উপাদানসমুহ শিক্ষার্থী শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করে থাকে। আর সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের এই লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়ে থাকে। আবার মূল্যের অপরিহার্য উপাদানসমুহ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। উভয়ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপাদানসমূহ সমানভাবে কাজ করে। মানব-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই দিকটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানব মনস্তত্ত্বে রয়েছে : ১. সংবেদনজাত প্রকৃতি, ২. আবেগজাত উপাদান, এবং ৩. সামাজিক উপাদান। বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হল:

১. সংবেদনজাত প্রকৃতি: মানুষের মনস্তত্ত্বে দু'ধরনের সংবেদন ভূমিকা রেখে থাকে: নৈতিক সংবেদনশীলতা (moral sensibility) এবং নান্দনিক সংবেদনশীলতা (aesthetic sensibility)। নৈতিক সংবেদশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমুহ হল: সাহস (courage), ভীরুতা (cowardice), সম্মান (reverence), বাধ্যবাধকতা (obligation), আত্মার বিশুদ্ধতা (purity of soul), চিন্তা ও কর্ম (thought and action)। আবার নান্দনিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদান হল সুন্দরের আদর্শ। নৈতিক সংবেদনশীলতা ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আর নান্দনিক সংবেদনশীলতা আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আত্মসমর্পণ, আত্মউৎসর্গ, মানবাত্মার মুক্তি, আত্ম-উন্নয়ন, সার্বিক মানব উ য়ন হল ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ।

আবার ব্যক্তির স্বাধীনতা, পরোপকার করা, উৎকর্ষ বিচার, জীবনের ভাবনাকে উদার-উন্মুক্তকরণ এবং জীবনবোধ সম্পর্কে পরিপূর্ণতা অর্জন করা হল আত্মিক মূল্যবোধের অংশ। তবে উভয় ধরনের মূল্যবোধ অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য।

২. আবেগজাত উপাদান: আবেগজাত উপাদানসমূহ ব্যক্তিকে মানবজাতির প্রতি আন্তরিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শনে সাহায্য করে। অন্যের প্রতি প্রীতি এবং সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আবেগ যুক্তিহীন নয়। যুক্তির সঙ্গে অবিমিশ্রিত হয়ে আবেগ কাজ করে।

৩. সামাজিক উপাদান: শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান হল অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক বোধ। সমাজে কোন ধরনের অর্থনৈতিক বণ্টনব্যবস্থা থাকবে, কিংবা কি ধরনের রাজনৈতিক বোধ-বুদ্ধি থাকবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে অস্বীকার করার বিকল্প নেই। জাতির উন্নয়ন, ভবিষ্যত পরিকল্পনা সবই সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠে। কিন্তু এই গড়ে উঠার প্রক্রিয়াটি কতোটা সংহত, সংযত তা বোঝার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে মনস্তত্ত্বের সামাজিক উপাদানসমূহ আমাদের শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিক্ষা এবং মূল্যবোধ আরো দুটি দিক থেকে সম্পর্কিত হয়ে থাকে: ১. শিক্ষার একটি দিক হল স্বনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (auto-education), আবার ২. মূল্যের একটি দিক হল স্বনিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ (auto-values)। স্বনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত, অন্যদিকে আত্মউপলব্ধির সঙ্গে সমন্বিত। স্বনিয়ন্ত্রিত মূল্য স্বয়ম্ভু, অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। সুতরাং শিক্ষা এবং মূল্যবোধের এ দুটি দিকই অভিন্ন। এদের একটির তৎপরতাকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। শিক্ষার লক্ষ্য মূল্যবোধ, আর মূল্যবোধ শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দেয়। এজন্য সার্থক শিক্ষার জন্য শিক্ষাকে অবশ্যই মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। সুতরাং শিক্ষা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে বলা যায়: ১. আমাদের মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে মূল্যবোধ জড়িত, ২. আমরা যখন কোনোকিছু শিখি তাতে আমরা মূলত মূল্যবোধের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করি, ৩. মূল্যবোধ শিক্ষাকর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে থাকে, ৪. অন্যদের প্রতি যত্নশীল এবং সম্মানের মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। এসবের ভেতর দিয়ে শিক্ষা আমাদের নীতিবোধকে জাগিয়ে তোলে।

ছয়

৬. বিভিন্ন স্তরে নীতিশিক্ষা

৬.১ (ক). প্রাথমিক পর্যায়ে নীতিশিক্ষা

এ পর্যায়টি শুরু হবে পাঁচ বছর বয়স থেকে। এখানে তাদেরকে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি শেখানো হবে। শিক্ষার্থীদের উপর কোনোকিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। খেলাচ্ছলে, গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। এ শেখানোর ভেতর দিয়ে তাকে নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

১.সাধারণ পাঠরীতি ——▶	১. কাউকে আঘাত করো না ২. অসহায়কে সহায়তা দেয় ৩. অপরের দুঃখে সহমর্মি হও	উপকারিতা মানবিকতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবে।

ছক ৪ : প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ পাঠরীতি

২. গল্প ও কবিতা ——▶	১. ভালো ও মঙ্গল বিষয়ক জ্ঞান ২. পরোপকার, অপরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে সে সংশ্লিষ্ট গল্প বা পুরাণকথা নির্বাচন করে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। ৩. সততা ও মহত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আত্মোৎসর্গ করার মানসিকতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যাঁরা মানবতার প্রতি সংবেদনশীল সেরকম ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো দরকার। এই লক্ষ্যে সেরকম ব্যক্তবর্গদের সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানাতে হবে।	উপকারিতা এরকম ব্যক্তিদে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীরা ন্যায়-নীতি সম্পর্কে সচেতনা হয়ে উঠবে।

ছক ৫ : প্রাথমিক পর্যায়ে নীতিশিক্ষা-সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু

নীতিশিক্ষার শর্ত হিসাবে আরো তিনটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিকাশ ঘটাতে হবে: ক. ভাবাবেগ (feelings), খ. সংবেদনশীলতা (sensibility) ও গ. প্রশংসা (appreciation)

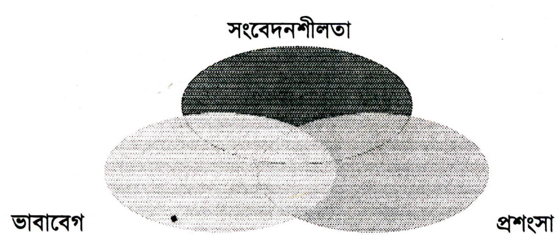

ডায়াগ্রাম ৬ : নীতিশিক্ষার তিনটি উপাদান

এক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য নৈতিক বিষয়াদি নিয়ে তাদের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে হবে। কোনো একটি কাজ ভালো এবং সেটি অধিকসংখ্যক মানুষের মঙ্গল নিয়ে আসবে এই ভাবনাটি অন্তর্নিহিত অর্থে ভাবাবেগ সমৃদ্ধ। সুতরাং নিজের মঙ্গলের ধারণার মতো অপরের মঙ্গলের ধারণাও যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

দুই. সংবেদনশীলতা নীতিশিক্ষার জন্য আরেকটি অপরিহার্য উপাদান। সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে যুক্তি অনেকটা নিষ্ক্রিয়। তারপরও নীতিশিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সংবেদনশীলতার গুরত্ব অনেক। মানবিকতার বিপর্যয়, যুদ্ধ দিয়ে মানবতার প্রতি যে সহিংসতা করা হয় এসবই অনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব অমানবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলার জন্য সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। অমানবিকতা, মানুষের প্রতি মানুষের সহিংসতা, যুদ্ধ, ক্ষুধা-দারদ্র্যি, অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা-বাসস্থানহীনতা এসবই মানবিক বিপর্যয়। এই মানবিক বিপর্যয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

তিন. শিক্ষার্থীদের ভালো ও মঙ্গলজনক কাজের জন্য প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসার কারণে সে নৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সচেতন হয়ে উঠবে।

৬.২ (খ). মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নীতিশিক্ষা

অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে তিনটি চূড়ান্ত আদর্শ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। মানব জীবনের তিনটি মানসিক চাহিদার সঙ্গে এই তিনটি আদর্শ সম্পৃক্ত। নিচের ডায়াগ্রামটি দেখা যাক-

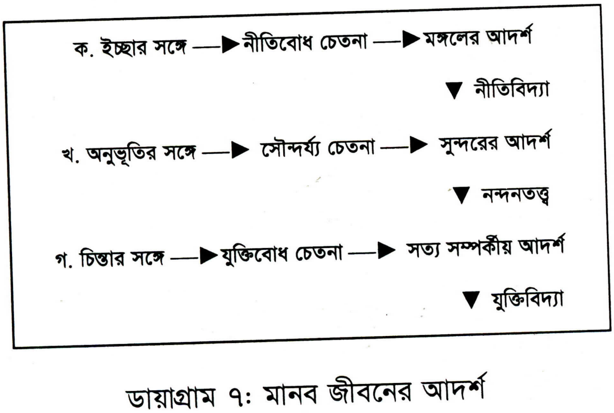

ডায়াগ্রাম ৭: মানব জীবনের আদর্শ

মানব জীবনে তিনটি আদর্শ রয়েছে: মঙ্গল, সত্য ও সুন্দরের আদর্শ। এ তিনটি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। নৈতিক উপলব্ধি এই তিনটি আদর্শের সমন্বয় ব্যতীত বাস্তবায়ন করা যাবে না।

চূড়ান্ত আদর্শ	শিক্ষার ধরন	অর্জিত শিক্ষা
মঙ্গল	শুভ বা মঙ্গল কী ? নৈতিকতা কীভাবে মঙ্গলকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মঙ্গলের ধারণা কীভাবে সম্পৃক্ত? ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সৎ-অসৎ, শিক্ষার্থীকে এসব প্রতিশব্দের সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে।	এতে করে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে কোন কাজটি থেকে কোন কাজটিকে আলাদা করতে হবে। সে কোন কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃকত্ করবে।
সত্য	সত্য সম্পর্কিত আদর্শকে জানার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে যুক্তিবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাব শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে : যুক্তি কী? সত্য থেকে মিথ্যা কীভাবে আলাদা করা যায়? যুক্তি কীভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠে?	এই যুক্তিজ্ঞান শিক্ষার্থীর মধ্যে যেমন বিজ্ঞানচেতনা জন্ম দিবে তেমনি তার মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ফলে সে যুক্তি থেকে অযুক্তিকে, সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করতে শিখবে।
সুন্দর	শিক্ষার্থীকে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। এজন্য প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য. নান্দনিক জ্ঞান দ্বারা শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করে তোলতে হবে। কারণ যে শিক্ষার্থী সুন্দরের প্রতি মুগ্ধ সে কখনো মন্দ কাজ করতে পারে না।	প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা, গল্প ও উপন্যাস পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করার ফলে তার মধ্যে প্রকৃতির মতো উদারতা, প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত নিয়মশৃঙ্খলা জন্ম নেবে।

ছক ৬: নীতিশিক্ষায় জীবনের আদর্শের স্বরূপ

৬.৩ কলা ও মানবিকী শিক্ষা : নীতিশিক্ষার স্বরূপ

কলা ও মানবিকী শিক্ষার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে নৈতিকতার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। কলা ও মানবিকী শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আমাদের বিভিন্ন শিক্ষানীতিতেও বলা হয়: মানবিক উৎকর্ষ সাধন, মানসিক বিকাশ ও নৈতিক জ্ঞান বিকাশের মধ্য দিয়ে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান দ্বারাও শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করা যায়। উপরের তালিকায় লিপিবদ্ধ ধারণাসমূহ নীতিশিক্ষার সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

নৈতিক ধারণা	বিবরণ
ন্যায় ।	সবার জন্য একই নিয়ম তাই হলো ন্যায়ের মূলনীতি। এই নীতিটি এমন যে এর সাহায্যে একট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণ বাস্তবায়ন করা যায়। আর্নেস্ট বার্কার ন্যায়ের যে সংজ্ঞাটি দেন তা প্রনিধানযোগ্য : মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠে তাই ন্যায়ের ভিত্তি। ব্যক্তিস্বার্থ এবং সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ও ন্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য। ন্যায়ের অনুষঙ্গ হিসাবে রয়েছে আইনের শাসন, গণ-মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন,

ছক ৭ : নৈতিক ধারণা হিসেবে 'ন্যায়'

নৈতিক ধারণা	বিবরণ
অধিকার ও কর্তব্য	অধিকার হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বত্ব বা দাবি। যেমন ভোটের অধিকার, সমানাধিকার, সুযোগের অধিকার, শিক্ষা-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য-নিরাপত্তার অধিকার এসবই ব্যক্তির প্রাপ্য। এসব প্রাপ্য ভোগ করার ফলে বিনিময়ে নাগরিক কিছু দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবে। কিছু কর্তব্য রয়েছে আইন দ্বারা স্বীকৃত, আবার কিছু কর্তব্য রয়েছে ব্যক্তির বিবেকবোধ ও ন্যায়বোধ থেকে উৎসারিত।
সমতা	রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলো সমতা। সমতা বিধানের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক চরিত্র বা অন্য কোনো শর্ত কাজ করবে না।

ছক ৮: বিভিন্ন নৈতিক ধারণার বিবরণ

৬.৪ উচ্চশিক্ষা: বিষয়ভিত্তিক নীতিশিক্ষার স্বরূপ

মানবিক শিক্ষার অংশ হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নীতিবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মাতৃভাষাসহ বিদেশী ভাষা এবং গণিত। এসব বিষয় পাঠদানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সততা, দয়া-মায়া, নিজস্বতা, শ্রদ্ধা, ন্যায় এবং সকলের প্রতি সমান আচরণ, বৈশ্বিক উপলব্ধি এবং বিচক্ষণতা অর্জন করবে। জ্ঞানের উপর্যুক্ত শাখাসমূহ অধ্যয়নের ফলে যে জ্ঞান অর্জিত হবে তাই তাকে প্রত্যক্ষভাবে নীতিশিক্ষার পাঠ নিতে সাহায্য করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যম্যে নীতিশিক্ষা অর্জন করা যায়। বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বৈশ্বিক উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা অর্জন করবে। বিজ্ঞানের এসব শাখা অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান অর্জিত হবে তাই শিক্ষার্থীকে নৈতিক জ্ঞানের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলবে। নিচের দুটি ছক লক্ষ্য করা যেতে পারে:

ক্যাটেগরি	বিষয়সমূহ	বৈশিষ্ট্য	বিষয়সমূহের উপাদান	শিক্ষাদান পদ্ধতি	অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণাবলী
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	পদার্থবিদ্যা	এসব বিষয় পাঠ করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী যে বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করবে : বুদ্ধিবৃত্তি, শৃঙ্খলা, পর্যায়ক্রমিক জ্ঞান, সংহতি ও সামঞ্জস্য, জটিলতা ও জৈবিক-কাঠামো	নিয়ম-কানুন, নীতি, ফর্মূলা, গণনাপদ্ধতি, পদার্থিক বিজ্ঞান, সৃজনশীল বিজ্ঞান	পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রমাণ এবং ডিজাইন	বৌদ্ধিক অধ্যাবসায়, যথাযথ কর্ম এবং ঘটনার সত্যতা
	রসায়ন		নিয়ম-কানুন, নীতি, ফর্মূলা, গণনাপদ্ধতি, পদার্থিক বিজ্ঞান, সৃজনশীল বিজ্ঞান	পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রমাণ এবং ডিজাইন	বৌদ্ধিক অধ্যাবসায়, যথাযথ কর্ম এবং ঘটনার সত্যতা
	ভূগোল		জ্যোর্তিবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, কোনো স্থানের	নিরীক্ষণ, প্রমাণ, বর্ণনালব্ধ পদ্ধতি	বৌদ্ধিক অধ্যাবসায়, মাতৃভূমির প্রতি আত্মোৎসর্গ এবং নান্দনিকতা
	প্রাণীবিদ্যা		প্রজাতি, নিয়ম, ভূবিদ্যা, প্রাণসম্পর্কীয় জ্ঞান, আবিষ্কার ও অনুসন্ধান	নিরীক্ষণ, প্রমাণ, বর্ণনালব্ধ পদ্ধতি	জীবনের প্রতি মর্যাদা, সংহতি, ভয়, নিজস্বতা এবং নান্দনিকতা
	প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান		প্রজাতির বৈচিত্র্য, পরিবেশগত কাঠামো, পরিবেশগত সংরক্ষণ এবং পরিবেশবাদী আচরণ	নিরীক্ষণ, প্রমাণ, বর্ণনালব্ধ পদ্ধতি	বৈচিত্র্য, সংহতি এবং নান্দনিকতা

ছক ৯: নীতিশিক্ষার জন্য প্রণীত পাঠ্যসূচি এবং অর্জিত নীতিবোধ

ক্যাটেগরি	বিষয়সমূহ	বিষয়সমূহের উপাদান	শিক্ষাদান পদ্ধতি	অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণাবলী
সমন্বিত কর্মকাণ্ড	প্রকৌশল নিয়ম-কানুন	তথ্য-প্রকৌশলী বিদ্যা	নীতি, পদ্ধতি, বিকাশ এবং কৌশলগত অনুশীলন।	নিয়ন্ত্রণ, সংহতি,
প্রযুক্তিবিদ্যা	নীতিবিদ্যা প্রকৌশলবিদ্যা কৌশলবিদ্যা	শ্রম এবং কৌশলগত শিক্ষা	দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা	স্বনির্ভরতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সাম্য

ছক ১০: প্রযুক্তিশিক্ষায় নীতিশিার উপাদান

৬.৫ পরিবেশ বিজ্ঞান: নীতিশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

সমকালীন বহুমুখী সংকটের মধ্যে পরিবেশ সংকট অন্যতম। পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন, জীবনকে আয়েশি ও ভোগবাদী করার পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা পরিবেশের উপর নানামুখী চাপ সৃষ্টি করে আসছি। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং পরিবেশকে আয়ত্তে আনার বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল অর্জন— এই দুয়ের যুগপৎ সম্মিলন পরিবেশ সংকটে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। গত এক শতকে কৃষি ব্যবস্থাপনায় যে কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন হয়েছে তা-ই নতুন করে ভাববার জন্য যথেষ্ট। কৃষিতে অতিরিক্ত মাত্রায় ফলন পাবার প্রত্যাশায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের ফলে এর প্রতিক্রিয়া মানব স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক প্রয়োজনীয় পোকামাকড় ও প্রাণী-বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। অধিক জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহাস্থলীর প্রয়োজন, জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ ও বসবাস করার জন্য আবাসস্থলের প্রয়োজন ইত্যাদি সব তৎপরতার মধ্য দিয়ে নির্বনায়ন একটি মামুলী কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় খড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ নানামুখী পরিবেশ সংকট আমাদের সুস্থ-অনুকূল বেঁচে থাকার শর্তটিকে সংশয়াপন্ন করে তুলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি পরিবেশ নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও পরিবেশ-সংকট একট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। পরিবেশগত সংকটের ফলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই আমাদের পাঠক্রমে পরিবেশ ভাবনার আরও গুরুত্ব থাকা উচিত। সমকালীন পরিবেশ সংকটের বাস্তবতায় পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ-শিক্ষা অত্যাবশ্যক। পরিবেশ অর্থনীতি, পরিবেশ বিজ্ঞান, পরিবেশ দর্শন, পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি মাত্রাকে সামনে রেখে আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষাকে বিন্যস্ত করতে পারি। পরিবেশ শিক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পরিবেশ-নীতিবিদ্যাকে গুরুত্ব দিতে পারি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ডায়াগ্রামে পরিবেশ নীতিশিক্ষার অবস্থান দেখানো হলো :

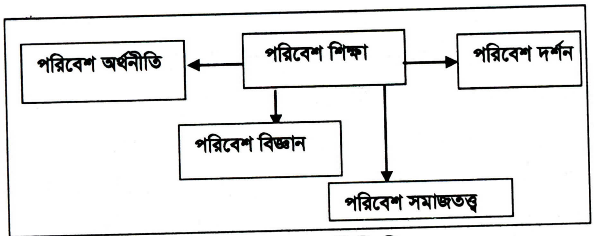

ডায়াগ্রাম ৮ : পরিবেশ নীতিশিক্ষার স্বরূপ

পরিপূর্ণ পরিবেশ-শিক্ষার জন্য পাঠক্রম বিন্যাসে পরিবেশ বিজ্ঞান, পরিবেশ সমাজতত্ত্ব, পরিবেশ অর্থনীতি এবং পরিবেশ দর্শন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারবে পরিবেশ কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কয়েকটি উৎস: পরিবেশ দূষণ, খরা, নির্বনায়ন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর লক্ষণীয় পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণসমূহ বুঝতে পারবে। পরিবেশ সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশের সামাজিক উপযোগিতা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সমকালীন বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা গিয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আমরা মূলত পরিবেশ প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করছি। তাই পরিবেশ সম্মত অর্থনৈতিক প্রয়াস সম্পর্কিত জ্ঞানও পরিবেশ শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আয়-ব্যায় বিশ্লেষণ, ধারণযোগ্য উন্নয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা এসব কৌশল সম্পর্কে জানার মাধ্যমেও পরিবেশসম্মত নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব। পরিবেশ দর্শন পরিবেশ শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান। পাঠক্রমে পরিবেশ দর্শন অন্তর্ভুক্তকরণ জরুরী একারণে যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ শিক্ষা ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পরিবেশ দর্শনের আওতায় যে বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে:

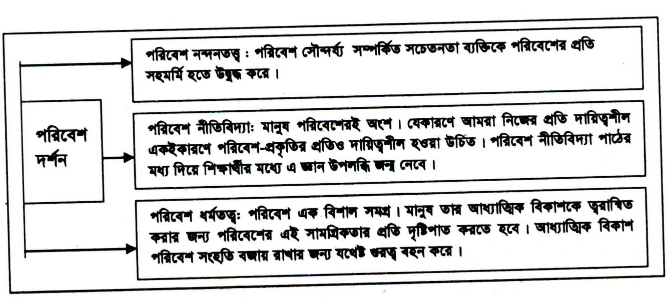

ডায়াগ্রাম-৯: পরিবেশ নীতিশিক্ষার বিষয়বস্তু

কেন পরিবেশ নীতিশিক্ষা? শুধু পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানই নয়; বরং পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, পরিবেশের মূল্যকে মানবীয় মূল্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করা পরিবেশ নীতিশিক্ষার লক্ষ্য। আমাদের বুঝতে হবে শুধু মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে ধারণযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়; একইভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করে আগামীদিনের সংহত পৃথিবীও প্রত্যাশা করা যাবে না। একারণে পরিবেশগত সংকটের এখনই একটি সুরাহা প্রয়োজন। ভোগবাদী বিজ্ঞান কিংবা উপযোগবাদী অর্থনীতি পরিবেশগত সংকটের যথার্থ সমাধান হতে পারে না। পরিবেশগত সংকট দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন বিকল্পধারার অর্থনীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সবুজ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। এসবের মধ্যে মূল্যবোধের অনুশীলন: যা গোটা মানবজাতিকে বোদ্ধা বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে না দেখে পরিবেশ-প্রকৃতির অংশ হিসেবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে সেরকম দার্শনিক পরিকল্পনা।

৬.৬ জৈব বিজ্ঞান: নীতিশিক্ষার পুনর্বিন্যাস

চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে পঠন-পাঠন করা হচ্ছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততার ধরনও বহুমাত্রিক। জ্ঞানের এসব শাখায় মানুষের জীবন, প্রাণ এসবের টেকসই যুক্তিযুক্ত অবস্থাকে পরখ করার জন্য নৈতিকতার অনুশীলন প্রয়োজন। এ বিবেচনায় চিকিৎসা নীতিবিদ্যা (medical ethics) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বিভিন্ন শাখা রয়েছে:

ডায়াগ্রাম-১০ : চিকিৎসা নীতিবিদ্যার আলোচতি বিষয়

কারণ চিকিৎসার সঙ্গে শুধু রোগবালাই সারার ব্যবস্থাপত্র প্রদান, ঔষধ প্রক্রিয়জাতকরণ, রোগ শনাক্তকরণই জড়িত নয়। যেমন ব্যক্তির নিজের প্রাণ তথা অন্যের প্রাণ হত্যার অধিকার আছে কী-না? কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির প্রানণাশের অধিকার কী চিকিৎসকের রয়েছে? জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা নির্মূলের জন্য কী অপ্রত্যাশিত ভ্রুণ হত্যা করা যাব? অথবা জনসংখ্যা কমিয়ে রাখার জন্য কী আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ (কন্ট্রাসেপটিভ) ব্যবহার করা যাবে? ইত্যাদি সব সমস্যা একান্তই চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সমস্যাসমূহ আরো জটিল। এ সমস্যাসমূহ

নিয়ে উত্থাপিত বিতর্কসমূহ মূলত নৈতিকতার সঙ্গে জড়িত। এজন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান, জৈব-প্রাণবিদ্যা বিষয়ক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে করে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞগণ সেরকম কোনো সংকটের মুখোমুখি হলে তার নৈতিক সমাধান অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবেন।

জেনেটিক, মানব ক্লোনিং আধুনিক প্রাণবিদ্যার এসব উদ্ভাবনসমূহ নৈতিক প্রশ্নসমূহকে আরো জোড়ালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। ফলে সেসব সমস্যার কী ধরনের সমাধান হতে পারে তার জন্য সমকালীন প্রাণ-নীতিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক পঠন-পাঠনসমূহ কারিকুলামে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৬.৭ ব্যবসায় নীতিশিক্ষা কেন প্রয়োজন?

মানব-সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে; ব্যবসা সংগঠন তন্মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিককালে ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব একটি আলোচিত বিষয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রভেদে এই দায়িত্বের ভিন্নতা লক্ষ্য করার মতো। কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী কখনো সামাজিক সমস্যা, অথবা ভোক্তার সমস্যাকে তুচ্ছ করে দেখেন না । রাষ্ট্র তথা জাতি ভেদে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, উন্নতদেশে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা এবং অনুন্নতদেশের ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা এক নয়। যেমন, ইউরোপের মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসার মূল নীতি হল - "লাভের সর্বোচ্চকরণ করা " – এখানে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো দর্শনই কার্যকর নয়, তাদের কাছে ব্যবসার অর্থ 'ব্যবসা'। আবার অনুন্নতদেশে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণাটিই স্পষ্ট নয়। ফলে লক্ষ্য করা যায় উভয় সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়িকগণ সমাজের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা কিংবা দায়িত্ব কর্তব্যের দায় নিতে চান না। কিন্তু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ারই অংশ। 'সমাজ' নামক দেহের একটি অঙ্গ হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রমসমূহ সামাজিক কৌশল দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। এজন্য বলা হয় ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে অনুসৃত। সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দার্শনিক বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টির সত্যতা আরো স্পষ্ট করা যায়। সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দার্শনিকদের বক্তব্যের মূলকথা হল – সর্বজনীন ইচ্ছা এবং চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সর্বজনীন ইচ্ছা এবং চুক্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের দায়বোধ, ঐক্য ও সংহতি। সুতরাং সামাজিক নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হিসেবে আমরা ঐক্য ও সংহতিকে ভাবতে পারি। এইসব গুণাবলীই হতে পারে ব্যবসায়-নৈতিকতার ভিত্তি।

উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যবসায় মুনাফা লাভের বিষয়টি গুরুত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে মানব কল্যাণের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু ক্রেতাদের কল্যাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা ক্রেতা শোষণ করা হচেছ বাংলাদেশের ব্যবসায়ের প্রকৃত হালচাল। এই অ-ব্যবসায়িক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে "ভেজাল পণ্য, নকল পণ্য, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন, দ্রব্যমূল্যের রাতারাতি ঊর্ধ্বগতি, পণ্যের গুণগত মানের প্রতি দৃষ্টিহীনতা, কালোবাজারী, মজুতদারী, বাতিলকৃত পণ্য বিক্রয়— এসবকিছুই বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত। ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা, বিক্রেতা এবং ভোক্তা সকলের মধ্যে দায়িত্বশীল সম্পর্কের জন্যই ব্যবসায়-নীতিশিক্ষাকে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

সাত

৭.১ শ্রেণীকক্ষে নীতিশিক্ষা: শিক্ষকের ভূমিকা

শ্রেণকিক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করবেন। এজন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, সমতা, সমবিচার, সম্মানবোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, উদারতা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করবেন। একাজে শিক্ষকগণ কখনো মডেল হিসাবে, কখনো-বা অংশিদার, প্রশ্নকর্তা, পরিদর্শক, পরিচর্যাকারী, সহায়তাকারী এবং বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত নীতি সম্পর্কিত এসব জ্ঞান শিক্ষার্থীগণ কাজে লাগাতে পারে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিষয়গুলো এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

১. সততা ও নিয়মনিষ্ঠা নৈতিকতারই একটি দিক। এক্ষেত্রে শিক্ষক মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন। এখানে শিক্ষক সততা ও সত্যভাষণের চর্চা করবেন। এই চর্চার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী শিখবে কীভাবে সত্যকে ধারণ করতে হয়। এজন্য শিক্ষক নিজে যেমন সত্যবাদী হবেন, শিক্ষার্থীকেও সত্য পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। সত্যভাষণ, সততা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ জন্ম নেবে।

২. সমতা আরেকটি নৈতিক গুণ। এই গুণ দ্বারা শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কে অংশিদারিত্বের ভূমিকায় আসতে হবে। একাজে শিক্ষকের উচিত ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষ কল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে বিবেচনা করা। শিক্ষার্থীদের সমান বিবেচনা করে তাদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে শিক্ষার্থী সমতার সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে সম্পৃক্ত হবে। সে নিজেও তার প্রায়োগিক জীবনে সমতা বিধানের চেষ্টা করবে।

৩. পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ জাগানোর প্রাথমিক কাজটি শিক্ষককেই করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর যে কোনো অবস্থার মানসিক পরিস্থিতি, চাহিদা, রুচি ও অবেগকে বুঝতে হবে; এই উপলব্ধির মাধ্যমে বোঝা যাবে একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর রুচি-অভিরুচিতে কখনোই যেন আঘাত না দেওয়া হয়। তাদেরকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। এসবের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে। সে নিজেরে অভিমত প্রকাশ করতে কার্পণ্য করবে না। প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না। নিজের মধ্যে একটি দায়িত্ববোধ তৈরি হবে। ফলে সে নিজেকে যেমন সম্মান করতে শিখবে, অন্যের প্রতিও তার এই সম্মানবোধ থাকবে।

৪. সহানুভূতি নৈতিক গুণাবলীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতির বোধ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষককেও শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তারা যখন কোনো সমস্যায় পড়বে, বিপদে পড়বে তখন তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এই মমত্ববোধ, স্নেহপ্রবণতা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে সহানুভূতির জন্ম দিতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থী বুঝবে তাকেও অন্যের প্রতি সহমর্মি হতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে।

৫. পরিচর্যাও একটি নৈতিক গুণ। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই গুণটির অনুপ্রবেশ করানোর জন্য শিক্ষককে একজন উৎসাহদাতা হিসাবে ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা কি করেছে কেমন করেছে এসব বিষয় নিয়ে যখন তখন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। কারো সমালোচনা এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই বিচক্ষণ হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীও অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত নেবে। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী কখনো বদমেজাজি কিংবা অপরের প্রতি নৃশংস হবেন না। শিক্ষার্থীও সহমর্মি হয়ে উঠবে।

আট

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করেছি সামাজিক সঙ্কটের মূলে রয়েছে নৈতিকতার স্খলন। তাই আমরা যদি জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চা করি, নিজের নীতিবোধের কাছে নিজেকে দায়বদ্ধ করে রাখি তাহলে কিছুটা হলেও সঙ্কট নিরসন করা সম্ভব ।এজন্য আমরা প্রস্তাব করব পাঠসূচিতে নীতিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য। এ কাজে অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে পাঠসূচিতে নীতিশিক্ষা বাস্তবায়নে বাধা কোথায়? অধ্যাপক আবদুল মতীন তাঁর "নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে"[৮] প্রবন্ধে এরকম কয়েকটি বাধার কথা বলেন:

[৮] মতীন, আবদুল, 'নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে', লোকায়ত, সম্পাদনা: আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, জুন, ১৯৮৩।

এক. আমাদের জনগণের মনে একটি বড় সংশয় ও আশঙ্কা হলো প্রস্তাবিত নীতিশিক্ষার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কি-না। কারণ প্রায়শ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের পিতারা স্বয়ং কালোবাজারি করেন, উৎকোচের জন্য হাত বাড়ান। এরকম দুর্বল নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক কারণেই সন্তানদের নীতিশিক্ষার প্রতি উৎসাহী হতে পারেন না।

দুই. রাষ্ট্রনায়ক যদি অগণতান্ত্রিকভাবে জবরদস্তির মাধ্যমে ক্ষমতাদখল করেন, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন তারা কোনোভাবেই নীতিশিক্ষার জন্য আন্তরিক হতে পারেন না। একারণে অগণতান্ত্রিকতার আবহে কোনো নীতিশিক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

তিন. আবার অনেকে মনে করেন অমঙ্গল বা মন্দের অস্তিত্ব না থাকলে মঙ্গলের বা ভালোকে উপলব্ধি করা যায় না। তারা মনে করেন "সংসার নাটকে খল চরিত্রের কোন ভূমিকা না-থাকলে নাটকটা মোটেই জমে উঠত না, জীবনে থাকত না সংঘাত-জনিত বৈচিত্র্য, দুঃখ-জনিত আনন্দ। এক শ্রেণীর দার্শনিকও অনেকটা এ-ভাবেই অমঙ্গলের অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এরকম ভাবনাকে উৎসাহিত করা অনৈতিকতাকে উৎসাহিত করার সামিল।

চার. ধর্মশিক্ষা কী নীতিশিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত? অধ্যায় তিন এ আমরা দেখিয়েছি ধর্ম এবং নৈতিকতা বিশেষ কারণে এক ও অভিন্ন নয়। এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিকত্বের দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে। অধ্যাপক মতীন (১৯৮৩) এ প্রসঙ্গে একটি যুগোপযোগী ভাষ্য দিয়েছেন।[৯] এখানে তিনি উল্লেখ করেন: একজন ব্যক্তি যিনি সামাজিক জীবনে ধর্মীয় আচরণ মেনে চলেন না সমাজ তাকে হেয় চোখে দেখে না। কিংবা কোনো একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করে সমাজ তাকে অসহ্য মনে করে না। যেমন দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল নিজেকে একজন নাস্তিক হিসেবে প্রচার করতেন। বার্ট্রান্ড রাসেলও লিখেছেন কেন আমি খ্রিষ্টান নই। এখন মিল যদি নিজেকে অনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করতেন, কিংবা রাসেল যদি লিখতেন কেন আমি নৈতিক নই তাহলে কী ঘটত? মিল একজন নীতিবাদী দার্শনিক হিসেবে যে প্রচার প্রসার ও সম্মান পেয়েছেন সেটা কী পেতেন? অথবা রাসেল কী নোবেল পুরস্কার কিংবা 'অর্ডার অব মেরিট' পেতেন? স্বভাবতই না। অধ্যাপক মতীন এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন- কাউকে চাকুরী পেতে হলে 'সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট' প্রয়োজন হয়। কোনোক্ষেত্রেই চাকুরীরর শর্ত হিসাবে 'পরহেজগারি সার্টিফিকেট' চাওয়া হয় না। একইভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পাত্র-পাত্রী পক্ষ পরস্পরকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কতোট ধার্মিক তা যতোটা গুরুত্ব দেন তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেন পাত্র বা পাত্রী নীতিবান কি-না। এসব দৃষ্টান্ত থেকে আমরাও

[৯] মতীন, আবদুল, 'নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে', লোকায়ত, সম্পাদনা: আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, জুন, ১৯৮৩।

সিদ্ধান্তে আসতে পারি ধর্ম দ্বারা নৈতিকতা প্রভাবিত হতে পারে না। নৈতিকতার একটি আলাদা ক্ষেত্র বা দৃষ্টিকোণ রয়েছে। সেটি একান্তই ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নয়

৯. উপসংহার

নীতিশিক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা আমরা লক্ষ্য করছি। নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে নীতিশিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিরোধ নেই। যেমন বিরোধ নেই চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, অর্থনীতি এবং রসায়নের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে। কারণ বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যা হলো এককেকটি কৌশল, জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞান বাস্তবায়নের এককেকটি ধারা। জ্ঞানের এসব কৌশল শেখানোর সময় আমরা যেমন ধর্মের সঙ্গে এর বিরোধ খুঁজে ফিরি না, তেমনি নীতিশিক্ষাও নৈতিকভাবে জীবন যাপনের একটি কৌশল। এর সঙ্গে ধর্মের বিরোধ খুঁজে বিতর্ক বাড়ানো উচিত নয়। আমাদের নীতিশিক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, মানবিকতা সর্বোপরি জাগতিকাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

সাংস্কৃতিক ক্ষয়িষ্ণুতা ও চিন্তা-চেতনায় অনৈতিকতা, অবক্ষয় যেন সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা ছাত্রসমাজ কেউই এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। সহিংসতা, সামাজিক অবিচার, অমানবিকতা, দারিদ্র্য— এসব ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতারই অবদান। নীতিহীনতা, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এই ক্ষয়িষ্ণুতা থেকেই নিসৃত হয়ে থাকে। অনেকসময় এসবের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক অনুশীলনকে দায়ী করা হয়ে থাকে। এছাড়া, নানামাত্রিক শোষণ-নিষ্পেষণের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনগণের অবচেতনে যে মনস্তাত্ত্বিক হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তাও এর জন্য দায়ী। এসব নানা কারণে রাষ্ট্র এবং জনগণ যে সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কথা তা না হয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় এটা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক শ্রেয়-বোধজনিত চেতনার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো—শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। যে শিক্ষাব্যবস্থায় থাকবে নীতিশিক্ষার অর্থবহ অন্তর্ভুক্তি; যে শিক্ষার আবেদন শুধু শ্রেণিকক্ষেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না; বরং তা থেকে বিচ্ছুরিত আলো- ন্যায় শুভ ও সুন্দরের বোধ- শিক্ষার্থীকে প্রাণিত করবে সমগ্র জীবন।

তথ্যনির্দেশ

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সম্পাদনায় বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি, নভেম্বও, ২০০৬ ।

গোলাম দস্তগীর (১৯৯০), 'ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতা', দর্শন ও প্রগতি, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ: ৫০-৫২ ।

মতীন, আবদুল, 'নীতিশিক্ষা প্রসঙ্গে', লোকায়ত, সম্পাদনা: আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, জুন, ১৯৮৩ ।

Calderwood (1890), Handbook of Moral Philosophy, (London: Macmillan), pp.315-317.

Lilie, W., An Introduction to Ethics, Matheun, London, 1965, Chap 1.

Mackenjie, John. S., Manuel of Ethics, University Tutorial Press, London, 1964, Chap: Two.

Marx, Karl, Thesis on Feuerbach

Naito, Takashi. "Moral Education in Japanese Public Schools," Moral Education Forum, Vol. 15, No. 2, pp. 27-36, Summer 1990.

R. B. Braithwaite (1955), An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief, (Cambridge: Cambridge press), pp.19 & 32.

Russell, B. Education and Social Order , chap. Religion in Education, London, : rpt. 1977, p.73.

Takahashi, Susumu., "An Overview of Reform and Tradition in Japanese Moral Education since 1868," Moral Education Forum, Vol. 13, No. 2, pp. 10-16, Summer 1988.

Taneja, V.R., Educational Thought and Practice, Calcutta, 1985.

Sen, A.K., On Economics and Ethics, Basil Blackwel, London, 1987.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা কাঠামোর বিবর্তনধারা একটি হালনাগাদ বিশ্লেষণ

(Investigation into the Evolution of Power Structure of Bangladesh Rural Elites)

ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্*

Abstract: The changing process in leadership structure of rural *Samajs* in Bangladesh is not smooth and automatic. Because of socio-economic and political turn change. The multi-dimensional growth in organization of rural Samaj and the significant change in power structure of rural *Samaj* have brought multi faceted flow in its leadership role. There is a continuous process of change in rural power structure formed with a combination of traditional and modern elements. The continuous pressure of political center on rural *Samaj* organization has through up a significant change in its formation process. The central government is enhancing the formal leadership instead of rural informal leadership. Thus the formal leadership is penetrating in the rural *Samaj* leadership and rural elites of traditional families are losing that leadership. This new leadership has ancient elements of traditional dignity as well as modern elements. They are in endeavor to practice power and influence facing the frequent challenges of contests and competitions to ensure participatory role in coordinated development efforts. The foremost condition of rational development is rural development in the context of developing countries in their contemporary realities. There is a bold demand to utilize the grassroots level leadership of Bangladesh in its series of failure in rural development. In this perspective the demand to analyze the evolution of power structure of Bangladesh rural elites may gain the justification.

ভূমিকা

গ্রামনির্ভর বাংলাদেশে ‘ক্ষমতা’ সমাজ কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় শহুরে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ক্ষমতা কাঠামো রয়েছে । বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল কিছুতেই রয়েছে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অস্তিত্ব । গ্রামের প্রতিটি লোক কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত । কেউ গ্রামীণ ক্ষমতার নেতৃত্বে অবস্থান করে, অন্যরা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত থাকে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে অবস্থান করছে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ, গ্রামীণ নেতা, গ্রাম্য মাতব্বর এবং

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, রাজশাহী ।

সর্বোপরি গ্রামীণ এলিটেরা। এলিট শ্রেণীর অস্তিত্ব গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তারা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং গ্রামের সকল কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ইতিপূর্বে যতোগুলো গবেষণায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ও এতে পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলোর সবগুলোই হয়েছে ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে যে সরকারগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের পরিবর্তিত নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ব্যবস্থায় এসেছে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। পূর্বে যে সকল উপাদান গ্রামীণ ক্ষমতার নেতৃত্ব নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো সেগুলোর অনেকগুলোর ভূমিকাই বর্তমান সময়ে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমান পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় কী পরিবর্তন এসেছে তা বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী।

লক্ষ্য:

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ বিশ্লেষণ;

খ) বাংলাদেশের গ্রামীণ নেতৃত্বের ধরন তদন্তকরণ;

গ) বাংলাদেশের গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামোর পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা পরীক্ষণ; এবং

ঘ) বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা পালনের উপযোগী নির্দেশনা প্রণয়ন।

গবেষণা পদ্ধতি:

এ গবেষণাকর্মটি লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে পরিচালিত বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন মির্জাপুর ও বিশালপুরের ২০০জন গ্রামীণ এলিটের ওপর পরিচালিত একটি জরীপভিত্তিক গবেষণাকর্ম। এতে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার পাশাপাশি গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা কাঠামোর বিবর্তন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এলিট ও গ্রামীণ এলিট -এর তত্ত্ব ও প্রত্যয়:

সতের শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষকে বিশেষায়িত করার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে কোনো উচ্চ সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এ

প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে।[১] ১৯৩০-৩৫-এ ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক রচনার মধ্যে দিয়ে তা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২] কোনো সমাজের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো গোষ্ঠীকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্যারেটো যখন এলিট শব্দটি ব্যবহার করেন তখন সম্ভবত এলিটের বহুমাত্রিকতা তাঁর মনে এসেছিলো।[৩] একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন, যারা সরকারের ওপর প্রবল প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক-এলিট এ বিশেষ গোষ্ঠীর লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore আরো দেখিয়েছেন যে, এলিটীয় তত্ত্ব মার্ক্সীয় শ্রেণীতত্ত্বের একটি বিপরীত পরিস্থিতি। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কার্ল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। মার্কসবাদীদের মতে শাসকগোষ্ঠী উৎপাদন শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। Mills (১৯৫৬) তাদেরকে এলিট শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন এবং সে সাথে ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন।[৪] তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে তার উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং দেখান যে, 'ক্ষমতা-এলিট' (Power Elite) হলো তা, যা সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। তাঁর মতে, ঐ ক্ষমতা-এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, Rose (১৯৬৭) সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক-এলিটদের (Economic Elite) ক্ষমতা বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। Rose (১৯৬৭) এর মতে, ব্যবসা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারীরা সমাজে একটি বিশেষ এলিট শ্রেণীর সৃষ্টি করে। আরেকজন খ্যাতিমান এলিট তাত্ত্বিক Dahl (১৯৬৩) ক্ষমতা-এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। Dahl সমাজের উঁচু শ্রেণী বলতে সেসব সদস্যদের ইঙ্গিত করেছেন, যারা সরকারের কেন্দ্রীয় পদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা সরকারের অধিকাংশ নীতি নির্ধারণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন।[৫] এলিট তত্ত্বের আরেকদল সমাজবিজ্ঞানী (Cole, 1956; Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965) আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন—যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি।

---

১ Bottomore, T. B., Elites and Society, London: C. A. Wates and Co., 1964.
২ Pareto, Vilfredo, The Mind and Society, New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.
৩ Pareto, op. cit.
৪ Mills, C. Wright, The Power Elite, New York: McGraw Hill Book Company, 1956, P. 13
৫ Dahl. Robert A, Who Governs, New Haren: Yale Univeristy Press, 1963

Lasswell (১৯৫২) এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন ।[৬] প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole (১৯৫৬) এলিট বলতে সে গোষ্ঠীকে বোঝান, যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করে । Kornhauser (১৯৬৫) এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন ।[৭] একই মতাবলম্বী বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens (১৯৭৩) এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেছেন । তিনি বলেন, ' এলিট তারাই, যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন' ।[৮]

ওপরে বর্ণিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণাবলীই একটি গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে । ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী Dube (১৯৫৯) গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন, যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, মর্যাদাবান, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে ।[৯] Sharma (১৯৭৯) গ্রামীণ এলিট বলতে সেসব ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন ।[১০]

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে সেসব লোককে এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিসিদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন । Schulze এবং Blumberg (১৯৫৭), Bonjean এবং Olson (১৯৬৪) এবং Jennings (১৯৬৪) এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে সামাজিক অবস্থানগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ।[১১] তারা ঐতিহ্যগত সুনামের (Reputational) অধিকারী এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি । যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যগত সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারছেন না । কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে । Karim (১৯৭৯) বাংলাদেশে রাজশাহীর

---

৬ Lassell, H. D. et. al. The Comparative study of Elites, Stanford: Hoover Institute, 1952.

৭ Koranhauser, William, The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal. 1965.

৮ Giddens, Anthony, Elites in the British Class Structure, in P. Stansworth and Anthony Giddeas, Elites and Power in British Society. London: Cambridge University Press, 1973,pp 3-4.

৯ Dube, S.C., Indian Changing Village: Human Factors in Community Development, Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1967.

১০ Sharma, Surjan Singh, Rural Elites in India, New Delhi: Sterling Publishers (Pvt) Ltd, 1979.

১১ Schulze, R.O. and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites, The American Journal of Sociology, 13 (3), 1959.

দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় খ্যাতিবান নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।[১২] পরবর্তীতে অবশ্য Karim (১৯৮৩) অন্য গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৩] বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের রীতিসিদ্ধ ও অরীতিসিদ্ধ উভয় ধরনের এলিটই গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে প্রভাবশালী হয়েছেন। শ্রীলংকার বিকাশমান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট গোষ্ঠীর ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যগত প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন।[১৪] Singer-এর এ সংজ্ঞায় একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীনতার কারণে নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এসব গ্রামে যারা গ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানগত দিক থেকে তাদের কারো সম্মানজনক ভূমিকা থাকতে পারে।

গ্রামীণ এলিট শনাক্তকরণ দৃষ্টিভঙ্গী:

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের শনাক্তকরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Schulze and Blumberg (১৯৫৭) গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোয় দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের শনাক্ত করেছেন: (১) অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গী (২) সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গী ।[১৫]

(ক) অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গী (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব শনাক্তকরণে অবস্থানগত পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলো।[১৬] অবস্থানগত এলিটবর্গ হলেন সেসব লোকজন,

---

১২ Karim, A.H.M. Zehadul, Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages, Dhaka: University Grants Commission, 1979.

১৩ Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh, (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.

১৪ Singer, Marshall, The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon, Cambridge: The Press, 1964.

১৫ Schule, R. C. and L. U. Blumberg, op. cit, p. 282

১৬ Hunter, Floyd, Community Power Structure: A Study of Decision Makers, Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.

যারা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কর্তৃত্বে অবস্থানগত ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানগত এলিটদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানগত এলিটের মোট সংখ্যা ১২২; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬ জন, সমবায় সমিতির নেতা ২৩ জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১ জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২ জন।

(খ) সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গী (Reputational Approach)

সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter (১৯৫৩) প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।[১৭] সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী উপায় হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি মূল্য বা Weightage পাবেন তারাই খ্যাতিমান নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim (১৯৯০) পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে[১৮] এবং Harjinder Singh (১৯৭৬) তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে[১৯] সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। মূলত এসব গ্রামপ্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামীণ সম্প্রদায়কে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় সম্মানসূচক এলিটের সংখ্যা মোট ৮৮।

(গ) বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Issue Participation Approach)

নেতৃত্ব শনাক্তকরণে বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ

---

[১৭] Hunter, op. cit.

[১৮] Karim, A.H.M. Zehadul, The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society, New Delhi: Northern Book Centre, 1990.

[১৯] Sing, Harjinder, Authority and Influence in two Sikh Villages, 1976.

দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh (১৯৭৬) পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের শনাক্ত করতে সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেছেন।[২০] গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণা এলাকায় বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট শনাক্ত করা হয়নি।

গ্রামীণ এলিটদের শনাক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের পর গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল।[২১] তাই বলা যায়, যারা উচ্চবংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। গ্রামীণ এসব এলিট নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে ও রেডিও-টেলিভিশন দেখে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। এ ছাড়াও তারা তাদের সন্তানদের রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন, যা গ্রামীণ উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হয়েছে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি (বর্গ)।

---

[২০] Sing, op. cit.,

[২১] Karim, op. cit.,1990 p. 38

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ:

ক্ষমতা সম্পর্কে মার্কস[২২] ও ওয়েবার[২৩] এ দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীই বহুল পরিচিত। মার্কস ব্যাপারটিকে দেখতে চেয়েছেন শ্রেণীস্বার্থের প্রেক্ষিতে। অন্যদিকে ওয়েবার এর ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন 'প্রভাব', 'কর্তৃত্ব' এবং 'আইন' এর দৃষ্টিকোণ থেকে। Poulantza (১৯৮৬) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে ক্ষমতাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ক্ষমতার ধারণা সামাজিক সম্পর্কের সেই যথাযথ ধরনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রাম দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করে।[২৪] গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকেও এ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীতেই সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। শ্রেণীসমূহের অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রেণিসমূহের ভূমিকা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক শক্তিসমূহ যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, ওয়েবারের সূত্রসমূহ ব্যবহার করে বলা যায়, গ্রামীণ উৎপাদন যন্ত্র, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কারা প্রভাব বা কর্তৃত্ব স্থাপন করবে, কিভাবে এ কর্তৃত্ব বিকশিত হবে এবং ক্ষমতার যেসব উপাদান তা নির্ধারণ করবে, সে উপাদানসমূহের সমন্বয়েই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর রূপরেখা তৈরি হয়।[২৫]

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো: ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

ষাটের দশকের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো অনুধাবনে গবেষকেরা নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বেশি আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেসময় গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার অন্যান্য উপাদানের চেয়ে নৃতাত্ত্বিক উপাদান অর্থাৎ সনাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাসমূহ প্রভাবশালী হওয়ার কারণেই সম্ভবত তারা এগুলোর মাধ্যমেই ক্ষমতা-কাঠামো ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন।

---

২২ Marx, K,The Eghiteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marxs and Engels Collected Works, Vol., ii, London, 1952

২৩ Weber, Max, The theary of Social and Economic Organization,London: New Oxford University Press,197

২৪ Pulantzas, N, Class Power in Steven Lukes (ed) Power, New York University Press, 1986.

২৫ রহমান, আতিউর, বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম, ঢাকা: প্রবর্তক প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ.৬৩।

ষাট ও সত্তরের দশকে গ্রামীণ বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতা-কাঠামোর উপাদানসমূহ শনাক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে Islam (১৯৭৪)[২৬], Bertocci (১৯৭০)[২৭], Zaidi (১৯৭০)[২৮] এবং Muyeed (১৯৭০)[২৯] উল্লেখযোগ্য।

Islam (১৯৭৪) তাঁর গবেষণায় তিন ধরনের গ্রামীণ নেতৃত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রথম ধরনের নেতৃত্ব গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রবেশের জন্য জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ব্যাপকতা ও বংশগত পরিচয়কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় ধরনের গ্রামীণ নেতারা হলেন মৌলভী বা মোল্লা। তৃতীয় ধরনের নেতারা হলেন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের (ইউনিয়ন কাউন্সিল) নেতা। Islam (১৯৭৪) এর মতে, গ্রামীণ বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো অসংখ্য উপাদানের ওপর নির্ভরশীল ছিলো, যেগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশ, সমাজের একটি সংগঠিত অংশ, সমাজ, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার কাঠামোর মতো আধুনিক প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

Bertocci (১৯৭০) গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম পরিবারগুলোর উঁচু বংশ (আশরাফ) ও নিচু বংশ (আতরাফ) এবং হিন্দু পরিবারগুলোর বিভিন্ন বর্ণভেদের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, মুসলিম পরিবারসমূহের উঁচু বংশ ও হিন্দু পরিবারসমুহের উঁচুবর্ণের পরিবারগুলোই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতো। এর বাইরে তিনি ক্ষমতার যে উপাদানগুলোর উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো ভূমি-মালিকানা তথা কার্যকর অর্থনৈতিক শক্তি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, সমাজ খেতাব ইত্যাদি।

গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Zaidi (১৯৭০) গ্রামীণ জনগণের সামাজিক মর্যাদা, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, জীবনযাত্রার মান, সাংস্কৃতিক প্রথা ও আচরণগত ধরনের ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভূমি-মালিকানা গ্রামীণ বাংলাদেশে সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

---

২৬ Islam, A.K.M., Aminul, A Bangladesh Village: Conflict and Cohesion: Anthropological Study of Politics, Cambridge: Schenkman Publishing Company, 1974.

২৭ Bertocci, Peter J, Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan (Unpublished Ph.D. Dissertation), Michigan State University, 1970.

২৮ Zaidi, S.M.H.,The Village Culture in Transition: A Study of East Pakistan Society, East West Centre Press, Honolulu, 1970.

২৯ Muyeed, Abdul, Strategies Evolved in a Development System of Planned Social Change in Rural East Pakistan: A Study of the Process of Institution Building and its Integration in Politico Administration Structure (Unpublished Ph.D. Thesis), Michigon State University, 1970.

বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের (বার্ড) গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য Muyeed (১৯৭০) যে গবেষণা করেছিলেন তাতে মূল্যবোধ, প্রথা, সমাজ, সংস্কৃতি -এ সবের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। Muyeed (১৯৭০) সনাতন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সেখানে একটি দ্বন্দ্বের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, যা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনশীলতার সৃষ্টি করেছে। আর সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রথা এ পরিবর্তনশীল পর্যায়কে পথনির্দেশ করছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো: সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক শক্তি, দলাদলি, সমাজ, সমবায় সমিতির মতো আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি।

তবে Islam (১৯৭৪), Bertocci (১৯৭০), Zaidi (১৯৭০) এবং Muyeed (১৯৭০) সকলেই মনে করেন, নতুন নেতৃত্ব ও সনাতন নেতৃত্বের সহাবস্থান দ্বন্দ্বমুখর নয় এবং এতে গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনও আসেনি। পরিবর্তন যেটুকু এসেছে তা কর্মতৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বাইরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমেও ষাটের দশকের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির চেষ্টা চালানো হয়েছে। সেসময় অর্থনৈতিক গবেষণার মাধ্যমে Sobhan (১৯৬৮)[৩০] এবং রাষ্ট্রনৈতিক গবেষণার মাধ্যমে Rashiduzzaman (১৯৬৮)[৩১] গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কিছু উপাদান বের করে আনেন। Sobhan (১৯৬৮) গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে কৃষি বহির্ভূত খাত থেকে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার কথা বলেছেন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসেবে তিনি অপর যেসব উপাদানের উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো: ভূমি মালিকানা, সামাজিক মর্যাদা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথা এবং গ্রামীণ সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহ।

Rashiduzzaman (১৯৬৮) গ্রমীণ ক্ষমতা কাঠামোয় মাতব্বর বা সরদারদের মতো আনুষ্ঠানিক বা সনাতন নেতৃবৃন্দের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের ক্ষমতার ভিত্তি মূলত বিপুল পরিমাণ ভূমির মালিকানা ও সামাজিক ও বংশগত মর্যাদা। তবে ভূমি মালিকানার জায়গায় কৃষি বহির্ভূত খাতসমূহের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার বিষয়টিও তাঁর গবেষণায় এসেছে। এর বাইরে যেসব উপাদানের কথা তিনি বলেছেন সেগুলো

---

[৩০] Sobhan, R, Basic Democracies, Works Programmes and Rural Development in East Pakistan, Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1968.

[৩১] Rashiduzzaman, M., Politics and Administration in the local Council: A Study of Union and District Councils in East Pakistan, Karachi: Oxford University Press, Dhaka, 1968.

হলো: শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলী, রাষ্ট্র ও পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগসূত্র, ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান, চাকুরি ইত্যাদি।

সত্তর দশকের উপাদানসমূহ:

সত্তরের দশকের গ্রামীণ সমাজে নৃতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের চেয়ে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ ক্ষমতা কাঠামোয় অধিক প্রভাবশালী ছিলো। এ সময়ে অর্থনৈতিক গবেষণার মাধ্যমে যে সকল গবেষক ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান নির্ণয়ে চেষ্টা চালান তাঁরা হলেন, যৌথভাবে Adnan, Kamal, Muqtada, Moyeen (১৯৭৫)[৩২], Adnan ও Mansoor (১৯৭৬)[৩৩], Jahangir (১৯৭৭)[৩৪], Blair (১৯৭৮)[৩৫], Haq (১৯৭৮)[৩৬] এবং Hartman ও Boyce (১৯৭৯)[৩৭]।

Adnan ও অন্যরা তাঁদের গবেষণায় ভূমি-মালিকানা, রাষ্ট্রের বা প্রশাসনের সাথে যোগসূত্র এবং সেচ যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদি আধুনিক কৃষি উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণকে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Adnan ও Mansoor (১৯৭৬) অপর এক গবেষণায় নতুন জেগে উঠা চরের ওপর নিয়ন্ত্রণও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর (বিশেষত: যে সব গ্রাম নদীর আশেপাশে অবস্থিত) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Jahangir (১৯৭৭) এর গবেষণায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি গ্রামাঞ্চলের দলাদলিকেও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন Blair (১৯৭৮)। তিনি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেখান যে, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার শুধুমাত্র ধনী কৃষকদেরই লাভবান করছে।

---

৩২ Adnan, Shapan, A Kamal, M. Muqtada, A.M. Moyeen, The Preliminary Findings of a Social and Economic Study of four Bangladesh Villages, Dhaka University Studies, 1975.

৩৩ Adnan, Shapan, Ahsan Habib Mansoor, Land, Power and Violence in Some Barishal Villages, N.A, 1976.

৩৪ Jahangir, B.K., The Nature of Clan Struggle in Bangladesh, 1977.

৩৫ Blair, W. Harry, Rural Development, Class Structure and Bureaucracy in Bangladesh, Pergaman Press, Printed in Great Britain, 1978.

৩৬ Haq. M. Ameerul (ed), Exploitation and the Rural Poor, Comilla: BARD, 1978.

৩৭ Hartman, Bertsy, James K. Boyce, Needless Hunger: Voice from a Bangladesh Village, Institute for Food and Development Policy, California, 1979.

Haq (১৯৭৮) তাঁর গবেষণায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক এ দু'ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। তবে ক্ষমতা কাঠামোয় অর্থনৈতিক সম্পর্কই ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

Hartman ও Boyce (১৯৭৯) গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসেবে জমিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সত্তরের দশকে নৃতাত্ত্বিক ও সামাজতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমেও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কিছু উপাদান বেরিয়ে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে যে দু'জন গবেষক ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তাঁরা হলেন Thorp (১৯৭৮)[৩৮] এবং Wood (১৯৭৮)[৩৯]।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতা কাঠামোকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেলিন, তাঁরা হলেন Chowdhury (১৯৭৮)[৪০] Alam (১৯৭৮)[৪১] এবং Arens ও Van Beurden (১৯৭৭)[৪২]।

Thorp (১৯৭৮) গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ভূমি মালিকানাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখিয়েছেন। এর বাইরেও তিনি বংশ ও জ্ঞাতিগোষ্টীর আকার, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বিশেষত স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

Wood (১৯৭৮) মনে করেন, এককভাবে গ্রামের পরিবারের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে কেন্দ্রীভূত হয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো নির্মাণ করে।

Chowdhury (১৯৭৮) গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সামাজিক মর্যাদা বা বর্ণ, রাষ্ট্রযন্ত্রে অনুপ্রবেশ, বংশ ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন।

Alam (১৯৭৮) তাঁর গবেষণায় সনাতন সমাজ-কাঠামোয় আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোয় যে পরিবর্তনশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

---

৩৮ Thorp, P. Joha, Power among the Farmers of Daripalla: A Bangladesh Village Study, CARITAS, Bangladesh, 1978.

৩৯ Wood, G. D., Class Differentiation and Power in Bandokgram: The Manifundist Case, Amerrul Haque (ed.) Exploitation and the Poor, Comilla: BARD, 1978.

৪০ Chowdhury, Anwarullah, A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification, Dhaka: Centre for Social Studies, 1978.

৪১ Alam, Manjurul, Rural Power Structure & Co-operative in Relation to Modernization of Agriculture, Comilla: BARD, 1978.

৪২ Arens, J. & Van Beurden, J., Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh, Amsterdam/Birmingham: Third World Publications, 1977.

Arens ও Van Beurden (১৯৭৭) নামের দু'জন ওলন্দাজ গবেষক (দম্পতি) তাঁদের গবেষণায় ভূমি মালিকানাকেই গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর বাইরেও তাঁরা সমাজ, বংশ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও জনশক্তি এবং রাজনৈতিক দল, বিশেষত, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য পদের কথা উল্লেখ করেছেন।

আশির দশকের উপাদানসমূহ:

আশির দশকে গ্রামীণ বাংলাদেশের ক্ষমতা-কাঠামো নির্ধারণে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। এ সময় যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্ষমতা-কাঠামোর উপাদানসমূহ নির্ধারণের চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, Jahangir (১৯৮২)[৪৩], Barman (১৯৮৩)[৪৪], Arn (১৯৮২, ১৯৮৪)[৪৫], Jahuruddin (১৯৮৭)[৪৬], Alam (১৯৮৭)[৪৭], Janhsen (১৯৮৭)[৪৮], Adnan (১৯৮৭)[৪৯], Rahman (১৯৮৯)[৫০] এবং Islam (১৯৮৮)[৫১]।

Jahangir (১৯৮২) গ্রামীণ বাংলাদেশে দু'ধরনের সামাজিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি তৈরি হয় বংশ ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে এবং অপরটি উৎপাদন সংস্থার ভিত্তিতে। তিনি মনে করেন, ভূমি ক্ষমতার প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তুত করে। ক্ষমতা-কাঠামোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকেও টেনে এনেছেন।

---

[৪৩] Jahangir, B.K., Rural Society, Power Structure and Class Practice, Dhaka: Centre for Social Studies, 1982.

[৪৪] Barman, Ch., Dalem, Emerging Leadership Pattern in Rural Bangladesh, Dhaka, 1983.

[৪৫] Arn, Ann-Lisbet, Dependence & Solidarity in Village Level Policies: Gram Sarker Elections in Bangladesh, BIDS-CDR, Dhaka-Copenhagen,, 1982.

-----, Local Power: Traditional Elite & Political Broker, Dhaka: National Institute of Local Government, 1984.

[৪৬] Jahuruddin, A.R.A., Rural Development and Informal Coalitions in a Bangladesh Village (Unpublished), Dhaka.

[৪৭] Alam, Khurshed, Commercialization of Agriculture and class Relations in Rural Bangladesh, (ed), Bangladesh Sociological Review, Dhaka University: Department of Sociology, 1987.

[৪৮] Jansen, G. Eirik, Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources, Dhaka: University Press Ltd., 1987.

[৪৯] Adnan, Shapan, The Roots of Power: A Re-Study of Daripalla in Rural Bangladesh (mimo),December 1988.

[৫০] Rahman, Atiur, Rural Power Structure and the Matbars in Bangla, Dhaka: Shamaj Nirikhayan, No, 32, 1989.

[৫১] Islam, S., Amirul, Modernization, Power and Values: Some Conceptual Issues, Dhaka University: Centre for Advanced Research in Social Science, 1988.

তিনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও বিকাশমান শ্রেণী সম্পর্ককেও ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

Barman (১৯৮৩) গ্রামাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের এ দু'ধরনের ক্ষমতার উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। অভ্যন্তরীণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূমি-মালিকানা এবং সমাজ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশ ইত্যাদি সনাতন প্রতিষ্ঠান। বাইরের উপাদানের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার, সমবায় সমিতি, পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে যোগসূত্র, ডিলারশীপ, চাকুরি, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। এর বাইরেও তিনি শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Arn (১৯৮২) এর গবেষণাও ভূমিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর বাইরে তিনি বংশ, শিক্ষা, প্রশাসনের সাথে যোগসূত্র, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, অকৃষিখাতের উপার্জন ইত্যাদি ক্ষমতার উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৪ সালে অপর এক গবেষণায় Arn (১৯৮৪) রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ, বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ও আইনগত সমর্থন, আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদিকেও গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন। ।

Jahuruddin (১৯৮৭) বংশের আকার, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রভাব ও ভূমি মালিকানাকে গ্রামীণ ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি তার গবেষণায় দেখান যে, আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব পুরোনো প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব থেকেই উঠে আসে।

Alam (১৯৮৭) এর গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের উন্নয়নের বদলে বরং সনাতন পদ্ধতির দলাদলির দ্বারা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো অনেক বেশি প্রভাবিত হয়।

Jansen (১৯৮৭) ভূমি মালিকানা, বংশ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ), রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Adnan (১৯৮৭) গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে শিক্ষা, ভূমি মালিকানা, সম্পদ মালিকানা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করেছেন।

আশির দশকে অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের ভিত্তিতেও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। এ সময়কার নৃতাত্ত্বিক গবেষকগণের

মধ্যে রয়েছেন Van Schandal (১৯৮১)[৫২], Ahmed (১৯৮৩)[৫৩], Arefeen (১৯৮৬)[৫৪], Karim (১৯৯০)[৫৫]। অর্থনৈতিক গবেষকগণের মধ্যে রয়েছেন Rahman (১৯৮১)[৫৬], Timm (১৯৮৩)[৫৭] ও Westergaard (১৯৮৫)[৫৮] এবং Blair (১৯৮৭)[৫৯]।

Van Schandal (১৯৮১) এর গবেষণায় ক্ষমতার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে এসেছে ধর্ম, পরিবার, বংশ ও উত্তরধিাকার ব্যবস্থার কথা। কিন্তু এ সবের ওপরেও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর বাইরে তিনি শহরের সাথে যোগসূত্র, মিলিটারী ও প্রশাসনের সাথে সংযোগ, দালালী, কৃষি বহির্ভূত উপার্জন এবং রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগকে ক্ষমতার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Ahmed (১৯৮৩) গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে সনাতন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও বংশ, রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসূত্র ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেছেন।

অর্থনৈতিক শক্তির ওপর (কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত উভয় খাতের) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে Arefeen (১৯৮৬) ক্ষমতার উপাদান হিসেবে জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশ, সামাজিক মর্যাদা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন।

Karim (১৯৯০) তার গবেষণায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় সনাতন ও আধুনিক এ দু'ধরনের উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সনাতন উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, প্রতিবেশী, বৃহৎ বংশ, বিপুল পরিমাণ জমির মালিকানা, উচ্চ বংশ বা খান্দান ইত্যাদি। আধুনিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে ভালো যোগাযোগ, শহর ও শহরতুল্য এলাকার সাথে যোগসূত্র, আধুনিক শিক্ষা, আঞ্চলিক ও জাতীয় বাজারের সাথে সমন্বয়, সমবায় সমিতি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি।

---

৫২ Van Schandal, Willem, Peasant Mobility-The odds of life Rural Bangladesh, Netherlands: Goram, Assem, 1981.

৫৩ Ahmed, A. B. Sharfuddin, Bizna: A Study of Power Structure in Contemporary Rural Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd. 1983.

৫৪ Arefeen,.H. K, Changing Agrarain Structure in Bangladesh- Shimulia: A Study of a Pari-urban Villages, Centre for Social Studies (CSS), Dhaka University, 1986.

৫৫ Karim, A.H.M. Zehadul op. cit, 1990.

৫৬ Rahman, Atiur, Rural Power Structure-A Study of the Local Leaders Level in Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Book International, 1981.

৫৭. Timm, W. Richard, Power Relations in Rural Development-The Case Study of Bangladesh, Hongkong: Centre for the Progress of Peoples, 1983.

৫৮ Westergaard, State and Rural Society in Bangladesh, Cirzon Press Ltd. London & Malmo Biddln Ltd. Cuildford & Kings Lynn, Britain, 1985.

৫৯ Blair, Harry, Decentralization and Development in Bangladesh: Trip Report on a visit to USAID Mission, in January, 1987, USAID, 1987.

Rahman এর গবেষণা থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর যে উপাদানসমূহ বেরিয়ে এসেছে সেগুলো হলো: ভূমি মালিকানা, শিক্ষা, কৃষি বহির্ভূত আয়, পুলিশ প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পলী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রভাবের ওপর আলোকপাত করে তিনি দেখান যে, এ ব্যাংকের আওতাভুক্ত গ্রামীণ দরিদ্ররা সনাতন ক্ষমতা কাঠামোর বিকল্প হিসেবে ক্রমাগত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। অবশ্য এ ব্যাংকের ক্ষেত্র খুব সীমিত এবং এর কর্মকাণ্ড থেকে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না।

Timm (১৯৮৩) গ্রামীণ ক্ষমতাকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ এ দু'ভগে ভাগ করেছেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূমি মালিকানা, সামাজিক মর্যাদা, ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্ব, অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব, বল প্রয়োগের সামর্থ্য ইত্যাদি। বহিঃস্থ উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদের স্থানীয় সদস্য, পুলিশ বাহিনী, রিলিফ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ইত্যাদি।

Westergaard (১৯৮৫) কৃষি বহির্ভূত উপার্জন, ভূমি মালিকানা, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদিকে গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখান যে, কৃষি বহির্ভূত উপার্জনের গুরুত্ব গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ভূমি মালিকানা গুরুত্বকে ক্রমাগত খর্ব করছে ।

Blair (১৯৮৭) এর গবেষণায় রাষ্ট্রকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা কাঠামোর বর্তমান নির্ধারক উপাদান

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোয় পূর্বতন কোন কোন উপাদানের বিদ্যমানতা রয়েছে এবং এর সাথে নতুন কোন কোন উপাদানের আবির্ভাব ঘটেছে বা আগের কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে নতুন কোন কোন উপাদানের তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে বিষয়গুলোরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের সাথে গ্রামীণ নেতৃত্বের উপাদানগুলোর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। লক্ষ্য করা গিয়েছে, ক্ষমতা কাঠামোয় যে সকল শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একইভাবে সে উপাদানগুলোর প্রভাব প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর নেতৃত্বের কার্যকারিতা প্রমাণ হয় নেতার ভূমিকার মাধ্যমে। গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদনসমূহ এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

১) ভূমি মালিকানা

গ্রামীণ ক্ষমতার একটি স্বাধীন উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা প্রায় সব গবেষকের কাছেই প্রাধান্য পেয়েছে। এ সংক্রান্ত ধ্রুপদী সকল গবেষকই ভূমি মালিকানাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬০] ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয়ও ভূমির শক্তিশালী অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[৬১] মানুষ মূলত দু'ভাগে ভূমির মালিক হতে পারে: প্রথমত, উত্তরাধিকার সূত্রে এবং দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছাপার্জিত উপায়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা ক্ষমতার সনাতন উপাদানের নির্দেশক এবং নতুন অর্জিত ভূমি একটি বিকাশমান ক্ষমতার ইঙ্গিতবহ। একজন ভূস্বামীর জমি ক্রয়ের পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য কাজ করে। সেগুলো হলো: আর্থিকভাবে অধিকতর লাভবান হওয়া, অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভূমি থাকলেই একজন ক্ষমতাশালী হবে এমন কথা বলা যায় না। কারণ ভূমির পাশাপাশি লোকবল, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ইত্যাদি থাকাও জরুরী। মূলত যেসব ভূস্বামীর ব্যাপক অর্থনৈতিক শক্তি আছে, অনেক লোকের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কর্তৃত্ব আছে তারাই ক্ষমতাশালী। এ কারণে বলা যায়, ভূমি গ্রামীণ ক্ষমতার একটি মৌলিক উপাদান হলেও, ক্ষমতার অন্যান্য উৎসের সঙ্গে যুক্ত না হলে তা পুরোপুরি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমান গবেষণা এলাকায় নির্বাচিত গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্বের একটি প্রধানতম উপাদান ভূমি মালিকানা। অন্যান্য উপাদান ক্রিয়াশীল থাকলেও কেবল ভূমির মালিকানা এবং অমালিকানার ভিত্তিতে সেসব উপাদানের কার্যকারিতা প্রমাণ হয়। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামীণ নেতৃত্বের জন্য ভূমি মালিকানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করছে।

২) অর্থনৈতিক শক্তি

কৃষি ও অকৃষি খাতের সমন্বয়ে যে অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠে তা ক্রমান্বয়ে ক্ষমতার একটি প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। রাজনীতি যেহেতু অর্থনীতিরই ঘনিভূত রূপ, সেহেতু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়।[৬২] অনেক গবেষকই আজ-কাল ভূমিকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখে অর্থনৈতিক শক্তির একটি অংশ হিসেবে দেখতে অধিক আগ্রহী। সাম্প্রতিক

৬০ Zaman, M.Q., Social Conflict and Political Process in Rural Bangladesh (Unpublished M.Phil Dissertation), Rajshahi University: IBS, 1977.

৬১ Sharma, SS, op. cit . 1979.
Darshankar, Ay, Leadership in Panchayati Raj, Jaipur: Panchsheel Prakashan, 1979.

৬২ ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: মেহের পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশে-ষণ (অপ্রকাশিত পিএই. ডি. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ২০০৩, পৃ.৬৮।

সময়ের প্রায় ৯০ ভাগ গবেষণায় অর্থনৈতিক শক্তিকে গ্রামীণ নেতৃত্বের জন্য আবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে। অকৃষি খাত থেকে বর্ধিত উপার্জনসমৃদ্ধ একটি ধনী ভূমি মালিক পরিবারের ভূমিকা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গুণগত পার্থক্য সূচনা করতে পারে।

অকৃষি খাতগুলোর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ছোটো-খাটো ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। ধনী কৃষক পরিবারগুলো কৃষি নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্যান্য পেশায় নিজেদের স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করছে এবং সফলতাও পাচ্ছে। আর এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় তারা ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করছে।

৩) সমাজ নেতৃত্ব

সমাজ হলো একটি সনাতন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান।[৬৩] সনাতন এ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব থাকে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের হাতে। আর প্রভাবশালী এ ব্যক্তিবর্গ বিশাল ভূমির মালিকও বটে।[৬৪] এমনটি ভারতীয় গ্রামীণ সমাজেও লক্ষ্য করা যায়।[৬৫] সমাজের নেতারা সাধারণত মাতব্বর, সর্দার, প্রধান কিংবা প্রামাণিক ইত্যাদি নামে এলাকাভেদে পরিচিত।[৬৬] এ নেতৃত্ব অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রেই তারা ভোগ করে থাকেন।[৬৭] সমাজ নামক এ সংগঠনটির প্রধান কাজ হচ্ছে ধর্মীয় প্রথা ও উৎসবগুলোর পরিকল্পনা ও তদারক করা এবং বিবদমান লোকজনের বিবাদ মীমাংসার জন্যে সালিশ বসানো।[৬৮] Karim (১৯৯০) অবশ্য কাজগুলোকে (ক) ধর্মীয় এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজ, (খ) রাজনৈতিক-বিচার সংক্রান্ত কাজ, (গ) অর্থনৈতিক ও জীবিকা সংক্রান্ত কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৯] তবে বিচার বিভাগ গ্রামের খুব কাছাকাছি চলে যাওয়ায় সালিশী ব্যবস্থা তার গুরুত্ব হারিয়েছে বলে কেউ কেউ যা আশংকা প্রকাশ করেছেন[৭০], সে প্রসঙ্গে বলা যায় বিচার বিভাগ নয় বরং জাতীয় রাজনীতির তৃণমূল পর্যায়ে অবাধ বিকাশ গ্রামীণ দ্বন্দ্ব মীমাংসায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

---

৬৩ বার্টোসি, পিটার জে. (বাংলায়), অস্পষ্ট গ্রাম: পূর্ব-পাকিস্থানের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন, ঢাকা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভার্ণমেন্ট, ১৯৯২, পৃ.১৭-১৮।

৬৪ Jahangir,B.K.,op.cit, 1982, pp.48-49.

৬৫ Sharma, SS, op.cit , Darshankar, Ay, op.cit

৬৬ Jahangir, B.K., Differentiation Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, Dacca: Centre for Social Studies, 1979, pp135-139.

৬৭ Zaman, M.Q., op.cit,

৬৮ রহমান, আতিউর, প্রাগুক্ত, ১৯৯১,পৃ.৬৮।

৬৯ Karim,op.cit, 1990, pp.120-121.

৭০ রহমান,প্রাগুক্ত,১৯৯১, পৃ.৬৫।

৪) বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় বড়ো বংশের নেতার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো বংশের নেতৃত্ব ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়।[৭১] তাছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৭২] বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব ক্ষমতার একটি সনাতন উৎস।[৭৩] কখনো কখনো একটি ক্ষুদ্র বংশের নেতৃত্ব ক্ষমতার অন্য উৎসগুলো ব্যবহার করে একটি বৃহৎ বংশের নেতৃত্বের জন্য হুমকির সৃষ্টি করতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বংশের ক্রমবর্ধমানশীল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বৃহৎ বংশের ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা সমভাবে কার্যকর হতে হবে। অবশ্য এ ক্ষমতা সমূলে উৎপাটন করা যেতে পারে। অনেকগুলো পরিবারের সমন্বিত অবস্থান অন্য সকলের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেহেতু বংশের নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে আসে, সেহেতু এটি ক্ষমতার একটি স্বাধীন উপাদান। সামাজিক শ্রেণীর প্রকট মেরুকরণ বংশের নেতৃত্বের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারে এবং মেরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত বংশ ক্ষমতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হিসেবে অবস্থান করে।[৭৪] কিন্তু গ্রামীণ সমাজে সামাজিক শ্রেণীর সে মেরুকরণ আদৌ সম্ভব কী-না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ওপর এ শ্রেণীসমূহের যে নির্ভরশীলতার চিত্র পাওয়া যায় তাতে করে তাদেরকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে Class itself হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

৫) জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব

বংশের মতো জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৭৫] এর প্রধান ভিত্তি হলো বৈবাহিক সংযোগ। বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সমর্থন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৭৬] বর্তমানে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ রাজনৈতিক

---

৭১ Ahmed, A. B. Sharfuddin, op.cit.,pp 113-.146.

৭২ রহমান, এস. এম. জিল্-ুর, বাংলাদেশের গ্রামীণ জ্ঞাতিত্ব, রাজশাহী: উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৯,পৃ.৮৭।

৭৩ করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল, বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন, সমাজ নিরীক্ষণ জার্নাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯১,পৃ.৫১।

৭৪ রহমান,প্রাগুক্ত,১৯৯১পৃ.৬৬।

৭৫ রহমান,প্রাগুক্ত,১৯৯৯পৃ.৯১।

৭৬ রহমান,প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ.১২।

নেতৃত্ব উপভোগ করতে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর আনুগত্য অবশ্য প্রয়োজন। এমনকি জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়েই আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব।

৬) ব্যক্তিগত গুণাবলী

শ্রেণীগত পটভূমি একই হওয়া সত্ত্বেও বক্তৃতা করা, জনমত সংগঠিত করা, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ও সাধারণ বিষয়ে জনগণকে সংগঠিত করার সামর্থ্য ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ গুণগুলো একজন ব্যক্তির মধ্যে তার অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে একে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ শিক্ষিত তরুণ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা ক্ষমতা কাঠামোয় প্রবেশের হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিগত গুণাবলীকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষমতা অর্জনে তারা এ দক্ষতাকেই কাজে লাগান। আর বর্তমানে ব্যক্তিগত গুণাবলী ক্ষমতার একটি স্বাধীন উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত এসব গুণাবলীর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নে তাদের তৎপরতা, গ্রাম সমাজের সংহতি রক্ষায় কৌশলী মনোভাব, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি নিজ গ্রামে নিয়ে আসার যোগ্যতা, গ্রামীণ ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, বিবাদ মীমাংসায় তাদের আন্তরিকতা এবং সমাধানের সঠিক প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৭) রাষ্ট্রের সাথে যোগসূত্র

রাষ্ট্র গ্রামীণ জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামীণ এলাকায় রাষ্ট্রীয় শক্তি পুলিশ বাহিনীর সাথে বিশেষ সখ্যতা ক্ষমতার উৎস বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গভীরভাবে গ্রামীণ এলাকায় প্রবেশ করেছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য নিতে হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্বাচিত কিছু ব্যক্তি এর আওতায় আসে। এ নির্বাচনের কাজও করে থাকে উক্ত মধ্যস্থতাকারী। বর্তমান সময়ে গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান হিসেবে রাষ্ট্রের সাথে যোগসূত্রকে চিহ্নিত করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষমতার এ উৎসটি একটি নির্ভরশীল উপাদান, যা ভূমি মালিকানা অর্থনৈতিক শক্তি, শিক্ষা, মধ্যস্থতা এবং রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল।

৮) ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব

ইউনিয়ন পরিষদ হলো স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। তরুণ শিক্ষিত কিন্তু সম্পদশালী ব্যক্তিরা ইউনিয়ন পরিষদের নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব এ নতুন প্রজন্ম নেতৃত্বের ধরনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে, যদিও

এতে গুণগত কোনো পরিবর্তন আসেনি[৭৭] তাছাড়া উচ্চ বংশমর্যাদার অধিকারী ঐতিহ্যিক গ্রামীণ এলিটদের সন্তানেরাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের অধিকারী হতে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব অর্জন করতে চায়। আর একাধিক উচ্চবংশের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বকেই নির্দেশ করে। তাছাড়া গ্রামীণ আনুষ্ঠানিক এবং বৈধ সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী এ স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর যে কোনো পর্যায়ের নেতৃত্বের শীর্ষ অবস্থান প্রদান করে। তাই ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা) এক সমীক্ষায় জানায়, গত এক দশকে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা গ্রামীণ নেতৃত্বে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।[৭৮]

৯) রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসূত্র

রাজনৈতিক দলের সাথে, বিশেষত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসূত্র গ্রামীণ সমাজে প্রভাবশালী হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।[৭৯] ষাট, সত্তর ও আশির দশকের গবেষণায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্তমানে গ্রামীণ নেতৃত্বের ৯৭.৫% শতাংশই কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রামীণ নেতৃত্ব নির্ধারণে ভূমির পরিবর্তে বর্তমানে প্রধান উৎস বিবেচিত হচ্ছে রাজনীতি।[৮০] বর্তমান গবেষণা এলাকায় একই চিত্রের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তবে এ কথা সত্য যে, যেসব লোক ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, সমাজ নেতৃত্ব, বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে শক্তিশালী অবস্থানে থাকে তাদেরকেই রাজনৈতিক দলে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদ নেই এমন কাউকে বর্তমান সময়ে নেতৃত্ব দেয়া সহজ নয়।

১০) শহরের সাথে যোগসূত্র

গত প্রায় পাঁচ দশকের বিভিন্ন গবেষণায় শহরের সাথে যোগসূত্রকে ক্ষমতার উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেসব ব্যক্তির সাথে শহরের যোগসূত্র রয়েছে তারা

---

৭৭ করিম, প্রাগুক্ত, ১৯৯১,পৃ.৫১-৫২।

৭৮ ফারুক, মুহাম্মদ উমর ও অন্যান্য, বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এক দশকে পরিবর্তন: একটি মাঠ পর্যায়ের বিশে-ষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, চতুর্বিংশতম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৭,পৃ.১১১-১২৫।

৭৯ Ahmed, A. B. Sharfuddin, op.cit,p 147.

৮০ ফারুক, মুহাম্মদ উমর ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১-১২৫।

গ্রামে খুব ক্ষমতাশালী হিসেবে পরিচিত। সত্তরের দশক থেকে বেশি সংখ্যক লোকজন চাকুরি, ব্যবসা, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি সূত্রে শহরে যাতায়াত শুরু করে। আশির দশক থেকে এ প্রবণতা আরো বেড়ে যায়। বর্তমানে শহরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে প্রত্যেকজন গ্রামীণ এলিট অত্যন্ত সচেতন এবং কৌশলী। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহরের লোকজন যেমন গ্রামীণ পটভূমিকায় আত্মীয়তার নিগুঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান, তেমনি গ্রামীণ এলিটেরা শহরে আত্মীয় সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে যোগসূত্র স্থাপন করতে চান। তাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শহরের সাথে যোগসূত্রের ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটেরা অনেক সুবিধা পান। অফিস-আদালতে নিজেদের কাজের তদারকীতে, থানা-পুলিশের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে আর্থিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সুবিধা অর্জনে এবং অন্যান্য বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এ ধরনের যোগসূত্র ব্যাপক মাত্রায় ভূমিকা রাখে। তাছাড়া শহরের সাথে যোগসূত্রকে গ্রামীণ সাধারণ মানুষেরা মর্যাদার চোখে দেখে।

১১) শিক্ষা

শিক্ষা যে কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে শিক্ষার গুরুত্ব আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ষাটের দশকে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। তাই শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান ছিলো অনেক ওপরে। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতো বেড়েছে চাকুরির সুযোগও ততো কমেছে। তাছাড়া কারো কারো মতে, সাধারণ মানুষ সত্তরের দশকে শিক্ষিত তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। কারণ তাদের অধিকাংশই কোনো উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত করতে পারেনি।[৮১] কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গ্রামের শিক্ষিত তরুণেরা স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে প্রবেশ করে। বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যান্য শিক্ষিত তরুণেরা তাতে অংশগ্রহণ করে গ্রাম পর্যায়ে তাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। তাছাড়া শিক্ষিত গ্রামীণ এলিটেরা যেমন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির কথা ভাবে এবং উন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করে তেমনি দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের সংগঠিত করতে পারে বলেই শিক্ষা গ্রামীণ নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষা সমাজে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি নির্ভরশীল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

---

[৮১] রহমান,প্রাগুক্ত,১৯৯১পৃ.৬৩-৭৮।

১২) সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে নেতৃত্ব

গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি তদারকের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বের বাইরেও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রথম এ কর্মসূচির শুরু হয়।[৮২] পরবর্তী সময়গুলোতে এ কর্মসূচিগুলো আরো বিস্তৃত হয়। এ কমিটির সদস্য হিসেবে একজন গ্রামীণ এলিট শুধু যে, প্রকল্পের অধীনে গরীব লোকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতো তা-নয় সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার কারণে গ্রামীণ সমাজের ওপর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[৮৩] তা ছাড় প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু লভ্যাংশ তাদের পকেটে চলে আসায় তাদের অর্থনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামীণ ক্ষমতার এটি একটি নির্ভরশীল উপাদানে পরিণত হয়েছে।

১৩) আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ

ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের উদ্যোগ নেয়ার পর সত্তরের দশকে সেচ-প্রযুক্তিতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে। সত্যিকার অর্থে ওয়াটার লর্ড শব্দটি তাদের জন্যই এসেছে, যারা এর সালিশ কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য হওয়ার বদৌলতে গভীর নলকূপের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় একটি শক্ত জায়গা করে নিয়েছেন।[৮৪] তবে ৯০ এর দশকের শুরু থেকে অগভীর শ্যালো মেশিনের সহজলভ্যতা গভীর নলকূপের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। ফলে গবেষণা এলাকার প্রায় প্রতিজন গ্রামীণ এলিটের একটি অথবা দু'টি শ্যালো মেশিনের মালিকানা রয়েছে। এছাড়া চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তি পাওয়ার ট্রিলারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। অধিকন্তু ধান মাড়াইয় পাওয়ার থ্রেসারের (স্থানীয় ভাষায় 'ভূত মেশিন') ব্যবহারও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে গবেষণাধীন এলাকায়। আর এসব প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন গ্রামীণ এলিটেরা। নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক কৃষকদের চাষাবাদের জন্য এসব প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাই বলা যায়, প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

৮২ চৌধুরী, আনোয়ারউল-হ্, বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা, ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ.১।

৮৩ Rahman, Shamsur, Role of Elites in Rural Development Programme (Unpublished), Rajshahi University: Department of Political Science, 1980, pp.33-.65.

৮৪ রহমান,প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ.৬৯।

১৪) উপদলীয় নেতৃত্ব

জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশ অথবা একই পেশাভুক্ত ব্যক্তির সমন্বয়ে জনগণের মধ্যে একটি সংগঠিত দল (উপদল) থাকতে পারে। জনগণের একটি সংগঠিত অংশের প্রাথমিক ভিত্তি হতে পারে জ্ঞাতিগোষ্ঠী। এ উপদল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এ উপদল প্রতিবন্ধকও হতে পারে। এটি গ্রামীণ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেমন করতে পারে, তেমনি যারা কোনো উপদলভুক্ত নয় তাদেরকে সম্পদের প্রবাহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। অকৃষি খাতের আয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে যদি এ অংশটি ক্ষমতা কাঠামোয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দলাদলি (ফ্যাকশনাল) নেতৃত্বের জায়গায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করায় ক্ষমতা কাঠামোর এ উৎসটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আওতাধীন হয়ে পড়েছে।[৮৫]

১৫) সহিংসতা সৃষ্টির সামর্থ্য

সহিংসতা বা সন্ত্রাস সৃষ্টির সামর্থ্য গ্রামীণ সামাজে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। গণতন্ত্র যেখানে অনুপস্থিত সেখানে স্থূল ক্ষমতা প্রদর্শনের যে প্রবণতা দেখা যায়, তারই প্রতিফলন হলো গ্রামীণ সমাজে সহিংসতা বা সন্ত্রাসের গ্রহণযোগ্যতা। সামাজিক শক্তিসমূহের সমর্থন ছাড়া সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে না। ষাটের দশকে সন্ত্রাসের মাত্রা ছিলো কম। সে সময়কার একটি গবেষণায়ও ক্ষমতার উপাদান হিসেবে সন্ত্রাসের উল্লেখ নেই। সত্তরের দশকে গ্রামগুলোতে অবৈধ অস্ত্র প্রবেশ করে এবং ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর সকলেই আর্মড ক্যাডারকে উৎসাহিত করে। ফলে তখন থেকেই সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮৬] বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর গবেষণায় বলা হয়, ক্ষমতাসীনদের সন্ত্রাসে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে গ্রামীণ শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনে অস্থিরতা ডেকে নিয়ে আসছে।[৮৭]

১৬) মহাজনী ব্যবস্থা

মহাজনী ব্যবস্থা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থা, ষাটের দশকের গ্রামীণ সমাজে ঋণ দাতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিলো যা আশির দশকে ক্রমান্বয়ে অনেক হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজে এ প্রক্রিয়া এখনো দেখা গেলেও এটি তার ঐতিহ্যগত চরিত্র হারিয়েছে। ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক

---

[৮৫] হক, মোঃ শামসূল, বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট: সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা বিশে-ষণ (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস), ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯২,পৃ.৪৬।

[৮৬] চৌধুরী, প্রাগুক্ত২০০৩, ।

[৮৭] ফারুক, মুহাম্মদ উমর ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪-১২৫।

ঋণ, গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা, গ্রামীণ সমাজে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এ ঋণদাতাদের তাৎপর্য কমিয়ে দিয়েছে। স্থানীয়-জাতীয় এনজিও-এর বিকাশ, সমবায় সমিতিভিত্তিক সঞ্চয়ী অর্থনৈতিক তৎপরতা বর্তমানে মহাজনী ব্যবস্থাকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে বলা যায়। এটি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি নির্ভরশীল উপাদান।

১৭) সমবায় সমিতিসমূহের নেতৃত্ব

সমবায় সমিতিসমূহের ওপর গ্রামীণ এলিটদের নিয়ন্ত্রণ তাদের ক্ষমতার একটি অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে কাজ করছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এটি একটি নির্ভরশীল উপাদান। ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাসম্পন্ন শিক্ষিত এলিটেরাই সমবায় সমিতির নেতৃত্বে আসীন।

১৮) চাকুরি

গ্রামীণ সমাজে চাকুরি ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা শুধু যে একজনের আয়ের সংস্থান করে তা-ই নয়, গ্রামীণ সমাজে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করে। একজন চাকরিজীবী তার গ্রামের অনেক লোককেই বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করে তাদের সাহায্য করতে পারেন। ষাটের দশক থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত চাকরি (সরকারি-আধাসরকারি) ক্ষমতার একটি উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বর্তমানের চাকুরি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি নির্ভরশীল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

রেখা চিত্র-১.১: গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বাধীন ও নির্ভরশীল উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

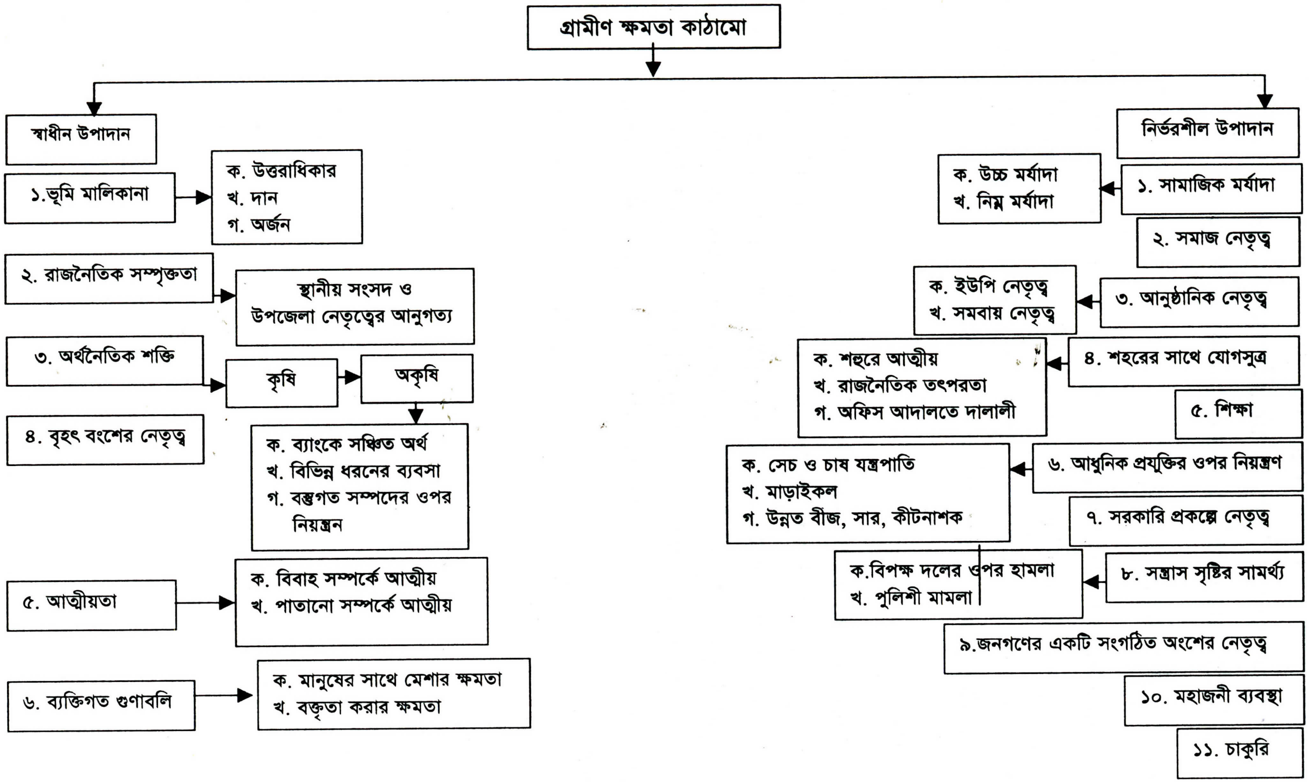

সূত্র: মাঠ জরীপ

মূল্যায়ন:

ষাটের দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত ভূমি ছিলো গ্রামীণ নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকেরাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতো বলে বিভিন্ন গবেষণাকর্মে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ নেতৃত্বের জন্য সমাজ নেতৃত্ব, বংশের নেতৃত্ব, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত গুণাবলী, রাষ্ট্রের সাথে যোগসূত্র, গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসূত্র, শিক্ষা, শহরের সাথে যোগসূত্র, সমবায় নেতৃত্ব, কৃষি সরঞ্জামাদির মালিকানা, গ্রামীণ দলাদলির নেতৃত্ব, সন্ত্রাস সৃষ্টির সামর্থ্য, চাকুরি, মহাজনী ব্যবস্থা, সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হতো। তবে নব্বইয়ের দশকের পর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনটি স্বচ্ছ জাতীয় নির্বাচন (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ ব্যতিরেকে) হয়েছে। এসব নির্বাচনে যেমন গ্রামীণ এলিটদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষণীয়, তেমনি নির্বাচনের পর দেখা গেছে গ্রামীণ এলাকায় ক্ষমতায়ন হওয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বড়ো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ক্ষমতাবান হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)-এর বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষায় দেখানো হয় যে, রাজনীতির সঙ্গে আরো যেসব উপাদান গ্রামীণ নেতৃত্বে ভূমিকা রাখছে তা হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্র, শিক্ষা, শহরের সঙ্গে যোগসূত্র, জনগণের একটি সংগঠিত অংশের নেতৃত্ব, সন্ত্রাস সৃষ্টির সামর্থ্য, ব্যক্তিগত গুণাবলী, সমবায় সমিতির নেতৃত্ব, চাকরি, মহাজনী ব্যবসা। এছাড়া যেসব লোক ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, সমাজ নেতৃত্ব, বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ইত্যাদিতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকে তাদেরকে রাজনৈতিক দলে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদ নেই এমন কারো বর্তমান সময়ে নেতৃত্বে আসীন হওয়া সহজ নয়। আর এ প্রক্রিয়ার ফলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীনরা তাদের নেতৃত্বের সুবিধার জন্য বর্তমান সময়ে ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর তৈরী করে গ্রামীণ সমাজকে সবচেয়ে বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের কথামতো গ্রামীণ এলাকার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এমন নেতৃত্বই এখন গ্রাম এলাকায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকছে। গ্রামীণ নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়, গত এক দশকে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা গ্রামীণ নেতৃত্বে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বের পাশাপাশি আরেকটি নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হলো: ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। আবার কোনো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা মেম্বারেরা বিরোধী দলের সমর্থক হলে বা সরকারি দলের বিরোধী গ্রুপে থাকলে তারা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় কোণঠাসা

হয়ে পড়ছেন। এছাড়া উক্ত গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, গত এক দশকে গ্রামীণ এলাকায় একটি মারাত্মক প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে প্রতিহিংসার বশে এবং ক্ষমতার দাপটে নিরীহ ব্যক্তিদের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে মামলা হচ্ছে। আগে গ্রাম এলাকায় কিছু ঘটলে স্থানীয় পর্যায়ে মীমাংসা হতো, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে তা মামলায় গড়াচ্ছে। জাতীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় দলাদলিও হচ্ছে এখন। এমনকি গ্রাম্য সালিশের ক্ষেত্রেও গত এক দশকে পরিবর্তন এসেছে। আগে গ্রামের বয়স্ক ধনী ব্যক্তি বা ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্যরা গ্রাম্য সালিশ করতেন। কিন্তু সালিশে এখন দলীয় ভিত্তিতে মাতব্বরদের দাওয়াত দেয়া হয়। যেসব মাতব্বর ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক তারাই এখন সালিশ করে থাকেন। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য এখন সালিশের জন্য পূর্বশর্ত নয়। বিরোধী দলের সমর্থকেরা নিজেদের সালিশে অংশগ্রহণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকেন।[৮৮] উক্ত গবেষণায় রাজনীতিকে প্রধান উৎস ধরে গ্রামীণ নেতৃত্বের অন্যান্য উপাদানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য উপাদানের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্মিলন ঘটলেই কেবল গ্রামীণ নেতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে বলে দেখানো হয়েছে। গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত রাজনৈতিক দলের সর্বজনীন তৎপরতা। রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতি জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনের বিকাশ রাজনৈতিক দলগুলোর বিস্তৃতি নিশ্চিত করতে পারে। ১৯৯০ পরবর্তী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছে। তাই এ সময় গ্রামীণ সনাতন বয়স্ক ঐতিহ্যপন্থী নেতৃত্বের পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক সচেতন তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে আধুনিক এ নেতৃত্বের উৎস ঐ সনাতন নেতৃত্বই। কারণ আধুনিক শিক্ষিত নেতারা সনাতন ঐতিহ্যিক নেতাদেরই সন্তান অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোক। আর এদের নেতৃত্বের প্রধান উৎস হলো ভূমি। তাই বর্তমান গবেষণা এলাকায় দেখা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ হলেও এ নেতৃত্বের অধিকারী গ্রামীণ এলিটেরাও গ্রামীণ ভূ-স্বামী অথবা তাদের বংশধর। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল এবং এরা শিক্ষিতও বটে। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রামীণ নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও গ্রাম পর্যায়ে ভূমি মালিকানা হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পূর্বশর্ত। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ভূমি মালিকানার মধ্যে সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ্রামীণ ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উৎস হিসেবে এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ততাকে গুরুপূর্ণ উৎস হিসেবে উক্ত গবেষণায় দেখানো হয়েছে। এনজিও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হতে পারে এবং এনজিও তার ক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। তা ছাড়া এনজিও-

[৮৮] ফারুক, মুহাম্মদ উমর ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪-১২৫।

সম্পৃক্ততা গ্রামীণ দরিদ্রদের মাঝে সমষ্টিবদ্ধতা তৈরী করে। যার ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ দরিদ্ররা ধনীক শ্রেণী ও মাতব্বদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের সামাজিক-রাজনৈতিক মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও তৎপর হয়ে উঠেছে। এভাবে এনজিওভুক্ত দরিদ্র শ্রেণী নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে ধনীদের ওপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ মাতব্বরদের জড়িত না করে নিজেদের কলহ-বিবাদের মীমাংসা নিজেরাই করছে।[৮৯] এনজিওর সম্পৃক্ততা গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে আত্মনির্ভরতার জন্ম দিচ্ছে। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ঐ শ্রেণী প্রভাব বিস্তার করছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এ প্রসঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এনজিও'র ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ ও বিতর্কের বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সামগ্রিক বিবেচনায় সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এনজিওর ভূমিকার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে:

(১) উন্নয়নের সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে দরিদ্রদের সহায়তা করা,

(২) উন্নয়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে জনগণকে সহায়ক করে তোলা এবং

(৩) যৌক্তিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে যথার্থ নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে প্রভাবিত করা।[৯০] এসবের ব্যতিক্রম ঘটলেই এনজিও'র ভূমিকা বিতর্কিত হয়ে পড়তে পারে। আর এ কারণেই এনজিওসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তেমনি আবার এর নেতিবাচক মূল্যায়নও লক্ষ্য করা যায়।[৯১] বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ও নানাসূত্র থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ ও সমাজ গবেষকদের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করলেও ব্যক্তিগত বিবেচনা বা রাজনৈতিক বিশ্বাস যে কারণেই হোক এনজিগুলোর ভূমিকা মূল্যায়নে তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিকই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

---

৮৯ Rahman, Atiur, Impact of Grameen Bank Intervention of the Rural Power Structure, Dhaka: BIDS, 1987.

৯০ Minear, Larry, The Role of Non-Governmental Organization in Development, Edward clay and John Show (ed.) Poverty, Development and Food, London; 1987, p213.

৯১ সামাদ, মুহাম্মদ, বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যমোচনে এনজিওর ভূমিকা, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪,পৃ.৬২।

ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ ইতিবাচক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে[৯২], উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি পাবলিক গভর্নমেন্টের বাইরে এনজিওসমূহ প্রাইভেট গভর্নমেন্ট হিসেবে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে[৯৩], এনজিওসমূহ কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করছে না[৯৪], এনজিওসমূহ সামাজিক রূপান্তরের বীজ বপন করে চলেছে।[৯৫] এ ধরনের বক্তব্যের পাশাপাশি আবার এনজিওসমূহ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট[৯৬], কিছু এনজিও ছাড়া অধিকাংশ এনজিও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকা পালন করে না[৯৭], এনজিওসমূহ দাতা-দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে[৯৮], এনজিওসমূহ বর্তমানে বুর্জোয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে কাজ করছে[৯৯] ইত্যাদি বক্তব্য তার প্রমাণ।

অপরদিকে এনজিও সম্পর্কে প্রশাসনিক এককেন্দ্রিকতা, আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং চাকুরি দেয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগও রয়েছে।[১০০] এসব বক্তব্য থেকে এ কথা ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে, কিছু এনজিও'র দারিদ্র্যমোচন কর্মকাণ্ড বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাদের নেতিবাচক ভূমিকা অন্য সব এনজিও'র উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ঋণ সহায়তা, কিস্তির অবিরাম তাগিদ, সুদের বোঝা দারিদ্র্য বিমোচনে সত্যিকার অর্থে কতোটুকু ভূমিকা রাখছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এ কারণে এনজিও'র সহযোগিতায় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসায়, প্রভাবশালী হয়ে ওঠায় এবং সর্বোপরি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তারে আত্মপ্রত্যয়ী ও অধিকার সচেতন হয়ে উঠছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে গবেষণা এলাকায় এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে কতিপয় এনজিও'র ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তায় গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু এনজিও সংশ্লিষ্টতায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে অথবা গ্রামীণ নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এনজিও'র সংশ্লিষ্টতাকে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ

[৯২] Nilu, Sk., Showkat Hossain, Dhaka: Dhaka Courier, 1-7 September 1989.

[৯৩] Jahuruddin, A.R.A., Rural Development and Informal Coalitions in a Bangladesh Village (Unpublished), Dhaka, 1989.

[৯৪] Rahman, Atiur, op.cit, 1987.

[৯৫] Nord, Mark, Dhaka: Dhaka Courier, 6-12 October 1989.

[৯৬] Umar, Badruddin, Dhaka: Dhaka Courier, 28 July-3 August 1989.

[৯৭] Rahman, Atiur, , Op.cit, 1987.

[৯৮] Hafiz, Mirza Golam, Dhaka: Dhaka Courier, 6-12 October 1989.

[৯৯] Akash, M.M., Dhaka Courier, 29 September-5 October 1989.

[১০০] সামাদ, মুহাম্মদ,প্রাগুক্ত,১৯৯৪,পৃ.৬৩।

এনজিওসমূহের সাথে গ্রামীণ এলিটদের যোগাযোগ এখনও যথেষ্ট না হওয়ায় নেতৃত্বের উপাদান হিসেবে গবেষণা এলাকায় এনজিও সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গ্রামীণ এসব এলিট এনজিও তৎপরতাকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী করে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এনজিও মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে কদাচিৎ ভূমিকা রাখলেও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় এনজিও'র প্রভাব লক্ষণীয় নয়। সেসাথে এ কথাও নিশ্চিত করে দাবি করা যায়, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় এনজিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে এনজিওকে অবশ্যই ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রামীণ এলিটদের সাথে যোগসূত্র তৈরী করতে হবে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করতে হবে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ধারায় গতি আসবে এবং গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্য তৈরি হবে।

উপসংহার:

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিবর্তন ধারায় লক্ষ্য করা যায়, ঐতিহ্যিক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় জাতীয় রাজনীতির প্রভাব নিশ্চিতভাবেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাস ব্যবস্থায় এনেছে নতুন মেরুকরণ। এ মেরুকরণে ক্ষমতাসীনেরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের জালকর্ম (Network) বিস্তার করেছে। এ জালকর্মের তৃণমূল পর্যায়ের পাত্র-পাত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীনদের অনুসারী গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে আরোপিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ। এর ফলে গ্রামীণ ঐতিহ্যিক সমাজ পরিচালনায় গ্রামীণ এলিটদের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়েছে, সমাজ পরিচালনায় সামাজিক ঐক্যের তুলনায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে, বিরোধী পক্ষ উপেক্ষিত হয়েছে। সমাজের সদস্যদের মাঝে তৈরী হয়েছে অভিযোগ-উত্তেজনা। ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের নেশায় বিরোধী পক্ষ সংগঠিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আদেশ বাস্তবায়নের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ সমাজের ভেতরে জাতীয় রাজনীতির অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, উত্তেজনা এবং দ্বিধা-বিভক্তির বীজ রোপণ করে চলেছে। ফলে বিরোধী পক্ষ মামলা এবং প্রশাসনিক হামলার শিকার হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং অন্যায়-অসঙ্গতির বিচার প্রার্থনায় সমাজ নেতা অপেক্ষা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের ওপর নির্ভরতা দেখাচ্ছে। কারণ ক্ষমতাসীন এসব রাজনৈতিক নেতাদের কবজায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন এবং আদালত। তবে এ নির্ভরতা চক্রের লিংক-পিন হিসেবে কাজ করছেন গ্রামীণ

এলিটেরা। গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তির জন্য তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির বিকাশ কাঙ্ক্ষিতই বটে। তবে বিকাশের এ প্রবাহটা হতে হবে সঠিক পথে। ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ রাজনীতির বিকাশ অর্থ আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ গ্রামীণ জনগণের সমষ্টিবদ্ধতা। জনগণের সমষ্টিবদ্ধতা গ্রামীণ উন্নয়নে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে। আর গ্রামীণ জনগণের এ সমষ্টিবদ্ধতার দায়িত্ব নেয়ার কথা গ্রামীণ এলিটদেরই। পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে হবে। উপর থেকে আরোপিত নেতৃত্ব নয়, বরং জনগণের মধ্য থেকে গড়া উঠা নেতৃত্বই যে কোনো উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে-এ পরামর্শ তাদের দেয়া হয়েছে।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিমালা: আল-কোরআনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

মোঃ লুৎফর রহমান*

Abstract: 'Al-Quran' as a complete code of life is the supreme guide for Muslims and Islamic States. It brings all sorts of directions regarding present and eternal life including the matters of personal, familial, social and state affairs i.e., socio-economic, political and administrative. It is true that the 'Quran' is the only religious constitutional guideline in the world, which contains the rules and regulations for governing efficient and accountable state machinery for the betterment of the society. The regime of the Prophet Mohammad (SM) is the golden age of state affairs for Muslims, which is considered as a model of political and administrative system for Islamic State. Especially, Medina State's administration proves its reality. This article attempts to provide the concept and framework of political and administrative directions existing in the 'Holy Quran'.

ভূমিকা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনে এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি তথা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির পার্থিব ও অপার্থিব উভয় বিষয়ের উন্নয়নের উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: "ওয়ালা তান্‌ছা নাছি'বাকা মিনাদ্‌দুনিয়া" অর্থাৎ "তোমরা পার্থিব অবজ্ঞা করোনা" (সূরা কাছাছ: ৭৭)। মুসলিম প্রার্থনায় দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির জন্য করুনাময়ের অনুগ্রহ চাওয়া হয় (সূরা বাকারা: ২০১)। আল-কোরআনের নির্দেশনা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমাজ ব্যবস্থা বলতে গেলে নানা রকম অনাচার, দুরাচার ও মিথ্যাচারে নিমজ্জিত ছিল; মানুষের জীবন ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও অপ-শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। আল-কোরআন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে (সূরা বাকারা : ২৫৭), অবসান হয় মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের; প্রতিষ্ঠিত হয় আইন ও ন্যায়ের শাসন। ফলে মানুষ স্বাদ পায় মুক্তি ও স্বাধীনতার। একটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে সর্বোত্তম সেবা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি, সমাজ জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সম্ভব। আর এরূপ একটি সৎ , দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ইঙ্গিত মহান আল্লাহ্ আল-কোরআনে প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনে যে রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁর মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। আলোচ্য প্রবন্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিমালাসমূহ আল-কোরআনের নির্দেশনার আলোকে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা থাকবে এবং শুরুতেই ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাঃ

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের উপর, ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ওপর। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কোনো ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। নয় বিশেষ কোনো জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, প্রকৃত পক্ষে তা হলো একটি মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র এবং তার সীমা, আওতা ও প্রভাব বিস্তীর্ণ ততখানি, যতখানি সম্প্রসারিত এ আদর্শের প্রভাব। এই কারণে তার জন্যে কোনো বিশেষ বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার গুরুত্ব স্বীকৃত নয়। এই প্রকৃতির কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বরাষ্ট্র হওয়া, যেখানে থাকবে অসংখ্য জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, বর্ণ ও গোত্রের লোক সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে।

যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে তাই যা ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ কারণে নাগরিকদের জন্যে শুধু শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের জীবন সংরক্ষণ ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ পর্যন্তই তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দায়িত্ব সীমিত হয়ে যেতে পারে না। বরং রাষ্ট্রের সর্বদিকে সর্বব্যাপারে ও সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী আইন ও বিধান পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী করা, জারি করা এবং মানব সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেয়াও তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে ইসলামী আকীদা মোতাবেক ব্যক্তিকে আল্লাহর বন্দেগী করা, বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং ইসলামী বিধান মোতাবেক বাস্তব পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের অবাধ সুযোগ সুবিধা করে দেয়াও তার কাজ। ইসলামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মন-মগজ ও মানসিকতা এবং স্বভাব চরিত্র ও আচার আচরণকে ইসলাম অনুরূপ বানিয়ে দেয়াও তার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এখানেই শেষ নয়, ইসলামী আদর্শের বিকাশ ও অনুসরণ করে চলার পথে যত

প্রকারেরই প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তার সব দূর করা, ইসলাম-বিরোধী চিন্তা, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় মতের প্রতিরোধ করাও তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত (জায়দান, ২০০০:১৮-১৯)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : "তারা সেই সব লোক, যাদের আমি যদি দুনিয়ার কোন অংশে ক্ষমতাসীন করে দেই, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রচলন করবে, লোকদেরকে যাবতীয় ভালকাজে বাধ্য করবে ও শরীয়াত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত সব ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্যে" (সূরা হাজ্জ : ৪১)।

এসবই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এ সব কিছুরই লক্ষ্য রাষ্ট্রের জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শরীয়াতভিত্তিক কল্যাণ সাধন। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে অন্যান্য সর্বপ্রকার রাষ্ট্রের তুলনায় অধিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

প্রশাসন ব্যবস্থা:

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এমন কার্যাবলীকে এমন উপায়ে পরিচালনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়। বস্তুত একাধিক সংখ্যক মানুষের এরকম দলবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই প্রশাসন-কলা (Art of Administration) পরিলক্ষিত হয়। প্রশাসনের ইংরেজী প্রতি শব্দ 'Administer' দু'টি ল্যাটিন শব্দ 'Ad' এবং 'Ministrare' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ দাঁড়ায় সেবা করা বা ব্যবস্থাপনা করা (Laxmikanth, 2001:1)।

বাংলাভাষায় প্রশাসন বা ইংরেজীতে 'Administer' বলতে আমরা সাধারণ অর্থে জনসাধারণের বিষয়াদি পরিচালনা বা বিষয়াদির দেখাশুনা করাকেই বুঝে থাকি (চক্রবর্তী, ১৯৮৫:৯)। প্রশাসন শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাজের ব্যবস্থাপনা। যে কোন প্রকার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা বা সেবা সাধনই সাধারণভাবে প্রশাসনের পর্যায়ভুক্ত। মোট কথা কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দলভিত্তিক কাজের সুষ্ঠু পরিচালনাই হচ্ছে প্রশাসন। তবে প্রশাসনিক কাজ হচ্ছে একটা যুক্তিসংগত কর্মপ্রচেষ্টা। সুতরাং বলা যায়, প্রশাসন বলতে সেই ধরনের দলীয় কাজ বুঝায় যাতে রয়েছে যুক্তিসংগত সংগঠন ও নানাবিধ কর্মচারীর সমন্বয় (রহমান, ১৯৯৩:২)। প্রশাসন হলো একটি সেবা প্রতিষ্ঠান (Service Organization) । জনগণের সেবা করা, তাদের সমস্যার সমাধান এবং জনগণকে নানাবিধ কাজে সাহায্য করাই প্রশাসনের মূলমন্ত্র (উদ্দিন, ২০০৪:১৮)।

আধুনিক যুগে প্রশাসন বলতে কর্মপ্রবাহ তথা কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা বুঝায়। এর ব্যাপ্তি সকল সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি অফিস পর্যন্ত। প্রশাসন এমন একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেখানে সংশ্লিষ্ট সকলকে (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) জনস্বার্থে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ "Administration is a kind of chorus" কোরাস বা দলীয় সংগীতে এক বা একাধিক সদস্য যদি বেসুরে গান শুরু অথবা বিলম্বে শুরু করে তাহলে ছন্দ পতনের ফলে অনুষ্ঠানটি ব্যর্থ হবে। অনুরূপ সরকারী দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলে জনস্বার্থে পরস্পরকে একযোগে যথাসময়ে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হলে বে-সুরে দলীয় সংগীতের মত প্রশাসন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এ যুগে প্রশাসন বলতে বুঝায় জনসেবা তথা সমাজে শান্তি -শৃংখলা , জনগণের মান সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং মানুষের কাজের পথ সুগম করে দেয়া (মিয়া, ১৯৯৮:২)।

E.N. Gladden বলেন " Administration is a long and slightly pompous word, but it has a humble meaning, for it means, to care for or look after people, to manage affairs..... is determined action taken in pursuit of a conscious purpose" (Laxmikanth, 2001:1).

সুতরাং আমরা বলতে পারি, সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পাদিত সকল কার্যাবলীই প্রশাসনিক। আমরা প্রশাসনকে যদি এক ধরনের দক্ষতা বা কলা হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে এটা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীকে বুঝায়।

লোক প্রশাসন:

'লোক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জনগণ। কিন্তু প্রশাসনিক পরিভাষায় ইংরেজীতে প্রচলিত 'Public' বা বাংলায় 'লোক' শব্দটি সরকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ইংরেজীতে Public Service Commission- বাংলায় সরকারি কর্ম কমিশন। আর প্রশাসন শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যক্তির সমন্বিত বা কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া। অতএব সহজ অর্থে, লোক প্রশাসন হচ্ছে সরকার বা সরকারি কর্মচারীদের কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া। এটা হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি, আন্তঃবিভাগীয় কর্মযোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং বহুবিধ বিধি-বিধানের সংমিশ্রণ (নূর, ১৩৯৭ বাং)।

আধুনিক প্রশাসনে লোক-প্রশাসনের উদ্দেশ্য প্রধানত তিনটি : ১) জনস্বার্থ সংরক্ষণ, ২) আইনের শাসন কায়েম এবং ৩) সরকারি কর্মে জনমতের প্রতিফলন ঘটানো।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, লোক-প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ বা জনসেবা (নূর, ১৩৯৭ বাং)।

L. D. White তাঁর *Introduction to the study of Administration* গ্রন্থে লোক প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে "Public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy" (Bhagwan & Bhashan,1996:3).

লোক প্রশাসন সম্পর্কে James W. Fesler (ভূইয়া, ১৯৯৯:৬) বলেছেন ,
" Public Administration is Policy Execution and Policy Formulation".

যদিও 'দক্ষতা' ও 'ব্যয় সংকোচনের' সাথে সরকাফর আইন বা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত নীতিসমূহের বাস্তবায়নই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের কাজ। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, লোক প্রশাসন শুধু নীতি বাস্তবায়নই করে না, নীতি প্রণয়নের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত (নূর, ১৩৯৭ বাং)।

ইসলাম:

ইসলাম শব্দটি আরবী মূল 'সল্‌ম' (SLM) শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ শান্তি, বিশুদ্ধতা, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বা বাধ্যতা (Abdalati,1980:7)। ইসলামের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ ; বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা ও প্রভূ আল-াহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ (আনিসুজ্জামান; নূর ও কাদের, ১৯৯৮-৯৯)। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে- Submission to the Will of Allah and obedience to His Law (Abdalati,1980:7). সুতরাং ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ইসলাম (মওদূদী, ২০০৩:৭)। ইসলামের একটি অর্থ যেহেতু শান্তি সেহেতু এটা ধ্রুব সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর আইনের আনুগত্যের মধ্যেই শান্তি নিহিত রয়েছে।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ Abul Hasim তাঁর *The Creed of Islam* গ্রন্থে বলেন, "Islam is a science which deals with man-his individual as well as social and collective organism" (Hashim,1990:23).

Michael H. Hart তাঁর '*The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in the History*' গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে বলেন, "Islam is not only the message

of Muhammad (p. b. u. h.) but it is the divine message from the days of Adam through Noah, Abraham, Moses, Jesus and finally integrated in the message of Muhammad (p. b. u. h.)" (Buraey,1985:50).

মোট কথা, আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র রাসুলের (সাঃ) সুন্নাহ্‌র অনুসরণে পরিচালিত এক সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম, যা প্রবর্তিত হয়েছে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য বলতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর প্রদত্ত বিধান বা নির্দেশাবলীর যথাযথ প্রতিপালনকে বুঝায় (আনিসুজ্জামান; নূর ও কাদের, ১৯৯৮-৯৯)।

ইসলামী প্রশাসন:

যে প্রশাসনে আল্লাহ্‌র আইন চালু থাকে এবং কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী প্রশাসন বলা হয়। অর্থাৎ যে প্রশাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত; আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস যে প্রশাসনে চালানো হয় তাই ইসলামী প্রশাসন। আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসুল (সাঃ) প্রদর্শিত মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম তার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ইসলামী প্রশাসন। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সর্বপর্যায়ে রয়েছে দ্বীন-ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ । ইসলামের এসব নির্দেশ বাস্তবে রূপ দানের জন্য আর দ্বীন-ইসলামকেই একমাত্র বিজয়ী মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী প্রশাসনের কোন বিকল্প নাই। ইসলামী প্রশাসনে মানুষ তার মৌলিক চাহিদার পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সামগ্রিক অগ্রগতি ও মর্যাদা, প্রসার ও ব্যপ্তি, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির মাধ্যম হচ্ছে ইসলামী প্রশাসন। ইসলামী প্রশাসন একই সাথে ব্যক্তির পার্থিব ও অপার্থিব, দেহ ও আত্মা, বস্তুগত ও অবস্তুগত ইত্যাদি সকল দিককে সমানভাবে বিবেচনা করে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই হোলিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে অধিক গুরুত্বপূর্ণ । এভাবে ইসলামী প্রশাসন মানুষের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয়বিধ উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে (সিদ্দিকী, ১৯৯৭)।

ইসলামী লোক-প্রশাসন ও লোক-প্রশাসন:

মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনগণের কল্যাণের অঙ্গীকারে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে যাত্রা

শুরু হয়েছিল ইসলামী লোক-প্রশাসনের। ইসলামী লোক-প্রাশাসন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার একটি উপ-পদ্ধতি (Sub-System) যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্‌র মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা (নূর, ১৯৯৭)। অন্যদিকে, লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারি সেবা বিতরণের জন্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপ্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে 'দক্ষতার' সাথে যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নই হচ্ছে পরম্পরাগতভাবে লোক প্রাশাসনের ঘোষিত লক্ষ্য (নূর, ১৯৯৭)। কিন্তু নব লোক-প্রশাসনবিদদের মতে, লোক-প্রশাসন যেহেতু শুধু নীতি বাস্তবায়নই করে না, নীতি প্রণয়নের সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেহেতু এটা মূল্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না। সুতরাং 'দক্ষতা' ও 'ব্যয় সংকোচনের' সাথে সাথে নতুন মূল্যবোধ অর্থাৎ 'সামাজিক ন্যায়বিচার' অর্জনের প্রতিও লোক-প্রশাসনকে প্রতিশ্রুতিশীল ও সক্রিয় হতে হবে (নূর, ১৯৯৭)। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আদর্শ ইসলামী প্রশাসন ও প্রচলিত লোক-প্রশাসন অথবা নব লোক-প্রশাসন -এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। ইসলামী লোক প্রশাসন (যা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে) জনগণের আধ্যত্মিক ও বস্তুগত উন্নয়নে লোক প্রশাসনের সাথে একবিন্দুতে মিলিত হয়ে সেই সব নীতি ও কাঠামো পরিবর্তনে প্রত্যাশী যা পদ্ধতিগতভাবে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করে। মুহাম্মদ-আল-ব্যুরের মতে,"সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধ, মানবতা ও মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও পরামর্শ এবং মানুষের অবস্থানের সার্বিক কল্যাণই হচ্ছে উভয় মডেলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়"(নূর, ১৯৯৭)। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলামী প্রশাসন ও লোক প্রশাসন অথবা নব লোক-প্রশাসনের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, যেখানে লোক-প্রশাসনের বিবেচনায় জীবন আত্মার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ইসলামের বিবেচনায় জীবন ও আত্মা, দেহ ও হৃদয় এবং বস্তু ও অবস্তু সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে, উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানুষের দৈহিক ও বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে, তার আত্মিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন (নূর, ১৯৯৭)। অর্থাৎ ইসলামী প্রশাসন বস্তুগত উন্নয়ন ছাড়াও মানুষের আধ্যাত্মিক বা মনস্তাত্ত্বিক মঙ্গলের প্রতিও মনোযোগী হয়, কিন্তু লোক-প্রশাসন শুধু মানুষের বস্তুগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

পবিত্র কোরআনে আলোচিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলী:

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ বলেন: "এটাই হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব একমাত্র এই পথেরই তোমরা অনুসরণ কর, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করোনা। কেননা ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে "(সুরা আনআম: ১৫৩)। যদিও কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে 'Administration' বা 'প্রশাসন'

শব্দটির উল্লেখ নাই; তবে প্রশাসনের সমার্থক বা সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ হিসাবে আরবী শব্দ 'ইউদাবিরু'[১] ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে নির্দেশ করা (To direct), পরিচালনা করা (To conduct), ব্যবস্থা করা (To manage), দিক নির্দেশনা দেয়া (To steer), সুবিন্যস্ত করা (To marshal), প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণ করা (To regulate), ব্যয় সংকোচন করা (To economize), পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (To devise a plan) ইত্যাদি (Buraey,1985:234)। সুতরাং একথা বলা যায় যে, ইসলামী প্রশাসন হিসেবে 'ইউদাবিরু'-এর অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে উল্লিখিত অর্থে নিহিত রয়েছে। ইসলামিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিমালাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সার্বভৌমত্ব, মানুষের মৌলিক অধিকার, নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি, বিচার প্রশাসন, প্রশাসনিক ন্যায়পরতা, সততা এবং দৃঢ়তা; জনগণের কর্তৃত্ব এবং পরামর্শের সাধারণ নীতিমালাসমূহ (Buraey,1985:234)। পবিত্র কোরআন মজীদে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলী সম্পর্কে যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মহানবী (সাঃ) তাঁর মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছিলেন। মূলত পবিত্র কোরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীতে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল একজন নবীই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান রাষ্ট্রনায়ক। গোত্রকলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরবদেরকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সংগঠনী ক্ষমতা এবং একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে মদীনা সনদের ভিত্তিতে তিনি গোড়াপত্তন করেন একটি উম্মাহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্রের। প্রফেসর ষ্টিফেন্স এর ভাষায়, "মহাবিজ্ঞান-প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে তিনি একই সাথে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন এনেছিলেন" (আমীন, ১৯৯৪)। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সমাজে নারীরা লাভ করেছিল বিশেষ মর্যাদা, রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদের মুক্তির সোপান, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়েছিল সংকুচিত। একটি ন্যায়ানুগ, কল্যাণকামী, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা যে সত্যিকার অর্থেই জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানসহ সার্বিক মঙ্গল ও সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল আল-কোরআনের নির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত মহানবীর (সাঃ) মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা সে সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। নিম্নে আল-কোরআনে বর্ণিত রাষ্ট্র ও প্রশাসন সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী আলোচনা করা হল:

[১] সূরা ইউনূস ঃ ৩ ও ৩১, সূরা রা'দ : ২ সূরা সাজদা ঃ ৫, পবিত্র কোরআনের এই চারটি আয়াতে ইউদাবির" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১. সার্বভৌমত্ব:

সার্বভৌমত্বের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Sovereignty' ল্যাটিন শব্দ 'Superanus' হতে ফরাসী শব্দ 'Sauverain'এর মাধ্যমে 'Sovereignty' শব্দের উদ্ভব হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ। পারিভাষিক অর্থে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক ধারণকৃত সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রের মূল উপাদান চারটি: ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার, ও সার্বভৌমত্ব। এ উপাদানগুলোর মাঝে সার্বভৌমত্ব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ সার্বভৌমত্বই অপরাপর সংস্থা থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করে এবং এ উপাদানটি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কল্পনাও করা যায় না (হক, ২০০১)। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ ব্যতীত কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই" (সূরা আলে- ইমরান: ১৮৯)। এ ধারণা পাশ্চাত্যের এ সম্পর্কিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুত পাশ্চাত্যে সার্বভৌমত্বের ধারণা ও ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের ধারণার মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল সার্বভৌমত্বের উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নের উপর। ইসলামকে বাদ দিয়ে আলোচনা করলে সার্বভৌত্বের উৎস হলো রাজতন্ত্রে রাজা, একনায়কতন্ত্রে একনায়ক, অভিজাততন্ত্রে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি এবং গণতন্ত্রে জনগণ। অন্যদিকে ইসলামী মতাদর্শ অনুসারে আকাশ-পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একমাত্র উৎস ও মালিক হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। মানুষ প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীতে তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ঘটায় (হক, ২০০১)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, " তুমি কি জান না যে,আল্লাহ্র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভোমত্ব। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহই্ সর্ব বিষয়ে একক ক্ষমতাবান" (সূরা মায়েদা: ৪০) ।

একইভাবে আল-কোরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তিনিই সবকিছুর উপর একক ক্ষমতাবান" (সূরা মায়েদা: ১২০)। সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ ; কিন্তু মানুষ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি (সূরা বাকারা: ৩০) হিসাবে এ পৃথিবীতে তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ঘটায়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর পক্ষ হতে এ দায়িত্ব প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা নয়, তার কাছ থেকে এ ক্ষমতা কেড়ে নেন। আল্লাহ্ বলেন, "বলুন হে আল্লাহ্ ! তুমিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে একক ক্ষমতাবান (সূরা আল-

ইমরান: ৪৭)। আল-কোরআনের আরও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে। যেমন সূরা ইউসূফ : ৪০ ; সূরা হাসর : ২৩ ; সূরা মূলক: ১ ; সূরা হাজ্জ : ৫৬ ; সূরা আম্বিয়া : ২২ ; সূরা লোকমান : ১৩ ; সূরা আলে-ইমরান: ৮৩, ১৫৪, ১৮৯ ; সূরা আন আম : ১৮, ৫৭ ; সূরা আরাফ : ৫৪ ; সূরা নূর : ৪২। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ এই যে, যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তারা আল্লাহর আইনের অধীন (নূর ও সিদ্দিকী, ১৯৯৫)। বস্তুত বহুসংখ্যক সার্বভৌমত্বের দাসত্ব থেকে মানব সভ্যতাকে মুক্ত করে এক আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের অধীন করার জন্যই আল্লাহ মহানবী (সাঃ)কে সর্বশেষ নবী ও রসূল রূপে (সূরা আহযাব : ৪০) প্রেরণ করেছেন (রহীম, ১৯৯৮:৯৭)। সুতরাং রাসুল (সাঃ) মানব জীবনে মহান আল্লাহ্‌র আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি। এর ভিত্তিতে আনুগত্য হচ্ছে অবিকল আল্লাহ্‌রই আনুগত্য। মদীনা-সনদ অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সার্বভৌম স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তার সেই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নাই। বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বোদিন, অষ্টিন ও হব্‌স সার্বভৌমত্ব বিষয়ে এ জাতীয় মতই পোষণ করেন (নূর ও সিদ্দিকী, ১৯৯৫)। প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী Harold J. Laski'র মতে Jean Bodin (১৫২৯-১৫৯৬ খৃ.) হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সার্বভৌমত্বের গুণাবলীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, জনগণের জন্য আইন দেয়ার একমাত্র ক্ষমতা সার্বভৌমের এবং সার্বভৌম নিজে কারও কাছ থেকে আইন গ্রহণ করেন না (হক, ২০০১)। John Austin (১৭৯০-১৮৫৮ খৃ.) এর মতে, "রাষ্ট্র হল আইনের দ্বারা গঠিত একটি ব্যবস্থা। এখানে একটি নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব থাকে এবং এ কর্তৃত্বই চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস। কোন রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম যেমন নির্দিষ্ট ও চরম ক্ষমতার অধিকারী তেমনি এ ক্ষমতা অসীম এবং অবাধ। তাঁর ইচ্ছা সীমিত নয় । কারণ, তাঁর কাজ বা ইচ্ছা প্রকাশের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের অর্থ হচ্ছে অন্য কোন ক্ষমতার ওপর তাঁকে নির্ভরশীল করে তোলা"(হক, ২০০১)। জন অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ নামে বিশ্বনন্দিত।

Thomas Hobes তাঁর গ্রন্থ '*Leviathan*'-এ বলেন, "The Ruler was above his own laws but under God's or under the law of nature (নূর ও সিদ্দিকী, ১৯৯৫). প্রকৃতপক্ষে মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্ ছিলেন আইনত সার্বভৌম এবং মহানবী (সাঃ) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকরী হলেও তিনি নিজে সার্বভৌম ছিলেন না। তিনি নিজে কখনও এ দাবী করেননি। সদ্য ইসলামে দীক্ষা লাভকারী জনৈক গোত্রপতি মহানবী (সাঃ) কে বললেন, "আপনি তো আমাদের বাদশাহ্।" মহানবী (সাঃ) তাৎক্ষণিক

উত্তর দিলেন,"বাদশাহ তো হলেন স্বয়ং আল্লাহ্, আমি নই।" একই ভাবে খলীফা, রাজা-বাদশাহ্ বা জনগণ কেউই সার্বভৌম নন। তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের যিম্মাদার। তাঁদের দায়িত্ব আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা ও তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা (হক, ২০০১)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি জনগণের মধ্যে পরম সত্যতা, সততা ও ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা কর" (সূরা ছোয়াদঃ ২৬)।

মানুষ মূলত মহান আল্লাহর নিকট থেকেই কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে এবং যিম্মাদার হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করে। এ কথা প্রমাণ করে যে, সার্বভৌমত্ব দু'রকমের। একটি প্রকৃত ও মৌলিক যা এককভাবে আল্লাহ্র। আর দ্বিতীয়টি হল প্রদত্ত বা অর্পিত। এ দুটি সার্বভৌমত্বের ধারণাই ইসলামে বিদ্যমান এবং এদের মাঝে কখনও বিরোধ বাধে না। কাজেই সার্বভৌমত্বের আসল মালিক আল্লাহ্ তায়ালা আর তাঁর পক্ষ থেকে এর ধারক হচ্ছে মুসলিম জনগণ (হক, ২০০১)।

২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাঃ

"The strong and the weak, the big and the small are equal in the eye of law"- এই ছিল ইসলামের নবী (সাঃ) এর শাসন ব্যবস্থার মূলকথা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে প্রত্যেকের বাক ও বিবেকের স্বাধীনতা উন্মুক্ত ছিল। সকলের ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন : "মুসলমানতো সকলে ভাই ভাই। অতএব দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্য হলে উভয়ের মধ্যে মিটমাট করে দাও" (সূরা হুজুরাত : ১০)।

আল্লাহ অন্যত্র এরশাদ করেছেন : "মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে" (সূরা শুরা : ৩৮)।

৩. নেতৃত্বের ধারণাঃ

প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের/প্রভাবিতকরণের একটি সফল প্রক্রিয়া হচ্ছে নেতৃত্ব। নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে- ability to influence a group of individuals towards achievement of common goals (Muslim,1999:46). নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তি আচরণের গুণ, যা মানুষকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

E.P. Hollander তাঁর '*Leadership and Power*' গ্রন্থে বলেন-Leadership is the process whereby one individual influences other group members toward the attainment of defined group or organizationl goal

(Jabnoun,1994:123). এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবতার ইতিহাসে মুহাম্মদ (সাঃ)-ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সুযোগ্য ও প্রভাবশালী নেতৃত্বের আসনে সমাসীন আছেন, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন (সূরা সাবা: ২৮)। তিনি তাঁর মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুসারীদেরকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতা দ্বারা পরিচালিত করেছিলেন। এ কারণে সারা বিশ্বের মুসলমান তাঁকে তাদের পথ প্রদর্শক, পরিচালক এবং আধ্যাত্মিক ও আইনগত নেতা হিসাবে বিবেচনা করে এবং তাঁর ইন্তেকালের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরও তাঁর পথ অনুসরণে ও তাঁর আদর্শ পালনে সচেষ্ট (নূর ও সিদ্দিকী, ১৯৯৫)। আর এই জন্যই Michael H. Hart বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন ব্যক্তির তালিকায় মুহাম্মদ (সঃ) কে শীর্ষে রেখেছেন। তিনি বলেন, "He was only one man in history, who was supremely successful on both religious and secular levels" (Hart,1998:33). মানবতার মহান নেতা মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "If there were three in a trip, they shall appoint a leader from among them ." (সহীহ আবু দাউদ) (Jabnoun,1994:123)। তাঁর এ বক্তব্য থেকে একথা পরিস্কার যে, যে কোন সামষ্টিক কার্য্যের সফলতার জন্য নেতৃত্ব আবশ্যক। অর্থাৎ ইসলামে নেতৃত্ব কেবল কাম্য নয় বরং অপরিহার্য। তবে ইসলামী নেতৃত্বে নেতার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অবকাশ নাই। ইসলামী নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত অর্থ ও সংজ্ঞা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে :

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, "আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের" (সূরা নেসা:৫৯)।

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি নেতৃত্ব দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজে আদেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে" (সূরা হাজ্জ:৪১)।

"আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত ; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম নেক কাজ করতে, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান করতে ; আর তারা আমারই আনুগত্য করত" (সূরা আম্বিয়া:৭৩)।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে যে, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত (নেতৃত্ব) দান করবেন, যেমনি ভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন। (সর্বোপরি) যে জীবন বিধানকে তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন তাকেও তাদের জন্য (সমাজে

ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের (ভয়ের) অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে শর্ত হচ্ছে যে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না"(সূরা নূর:৫৫)।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামী নেতৃত্ব আরোপিত বা খেয়ালী কোন বিষয় নয় বরং এটা এমন এক কর্তৃত্ব যা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে চর্চা করা হয় যারা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বাস্তব অনুসারী। ইসলামী নেতৃত্বের আচরণ হবে অনুসারীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। মুসলমানদের জন্য এ ধরনের নেতা ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সাঃ) যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) এর মাঝে অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং পরকালে মুক্তির আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (সূরা আহযাব : ২১)। দলের প্রতি নেতার সৎ আচরণ, উচ্চ নৈতিকমান ও মূল্যবোধ নিঃসন্দেহে তাঁকে দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সহযোগিতার নিশ্চয়তা বিধান করে (সিদ্দিকী, ১৯৯৭)।

৪. প্রশাসকের গুণাবলী বা নেতৃত্বের যোগ্যতা:

বিখ্যাত প্রশাসন বিজ্ঞানী L.D.White এর সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, সংগঠনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ, উদ্দেশ্য লাভের নির্দেশ বা আদেশ প্রদান, বিভিন্ন জনের কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডকে যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তারাই প্রশাসক। যেহেতু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রশাসন অর্থ সেবা; অতএব, সেবাকার্য যিনি পরিচালনা করেন তিনিই হলেন প্রশাসক। অর্থাৎ জনগণের সেবা করা, জনগণের সমস্যার সমাধান করা এবং জনগণকে নানাবিধ কার্যে যাঁরা সহায়তা করেন তাঁরাই হলেন প্রশাসক (বাহাদুর, ১৯৯৬)।

ইসলামী প্রশাসনের প্রশাসক হবেন তাকওয়াবান সক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের সার্বিক গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে। ইসলামী প্রশাসনের নেতৃত্বের যোগ্য তারাই যারা সামজের অন্যান্যদের তুলনায় মানসিক, শারিরীক ও আধ্যাত্মিক তথা সার্বিক দিক থেকে উন্নত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "কর্মচারী হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে (শারিরীক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত হবে" (সূরা কাছাছ:২৬)।

" সে (ইউসুফ) (বাদশাহকে) বললো, (যদি তুমি আমাকে বিশ্বস্তই মনে কর তাহলে) রাজ্যের এই (বিশৃংখল খাদ্য) ভাণ্ডারের দায়িত্বে আমাকে নিযুক্ত কর, (আমি) অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও (অর্থ পরিচালনায়) অভিজ্ঞ বটে" (সূরা ইউসুফ:৫৫)।

প্রশাসকের অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে ইসলামের প্রতি গভীর ও পূর্ণ ঈমান; প্রশাসনিক দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সুচারুরূপে পালনের জন্য সহজাত যোগ্যতা; রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় সর্বাগ্রসর ; ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার ; ইসলামী আইন বিধানে পারদর্শী এবং মানবিক ও উন্নতমানের চরিত্র ইত্যাদি (সিদ্দিকী, ১৯৯৭)। কেননা একজন প্রশাসক হিসাবে যিনি নিযুক্ত হবেন তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ। আর এজন্যই আল্লাহ্ সৎ ও নিঃস্বার্থ, দুর্নীতিমুক্ত ও নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক বা নেতা হিসাবে মনোনীত করার তাগীদ দিয়েছেন মুমিনদের প্রতি। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা অনুসরণ কর তাঁদেরকে যাঁরা 'সৎ' এবং যাঁরা তোমাদের কাছে কোন 'প্রতিদান' চায় না"(সূরা ইয়াসীন:২১)। এটা সত্য যে, সৎ ও খোদাভীরু ব্যতীত কোন অসৎ ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তিকে প্রশাসকের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করলে সে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের পরিবর্তে দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমনের কাজ শুরু করবে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইসলামী দার্শনিক আল-ফারাবীর মতে, প্রশাসকদের আবশ্যকীয় গুণাবলী হচ্ছে ক) বুদ্ধিমত্তা, খ) উত্তম স্মৃতিশক্তি, গ) বাগ্মীতা, ঘ) চারিত্রিক দৃঢ়তা, ঙ) ন্যায়বিচার-প্রীতি, চ) উচ্ছল, প্রাণবন্ত ও সপ্রতিভ ভাবভঙ্গী ছ) সত্যবাদিতা (মিয়া, ১৯৯৮:১০)।

পল.এইচ.এপলবি, জাতিসংঘ এবং হযরত আলী (রাঃ) জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুপ্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় যে সকল গুণাবলীর কথা বলেছেন তা নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো :

	পল.এইচ.এপ্‌লবি	জাতিসংঘ	হযরত আলী (রাঃ)
সুপ্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী	১। চারিত্রিক দৃঢ়তা ; ২। স্বীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বোধ ; ৩। দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ ও জবাবদিহিতার মনোভাব ; ৪। উত্তম শ্রোতা ও সমস্যার সমাধানকারী ; ৫। সংবেদনশীলতা ; ৬। সাংগঠনিক শক্তির উপর আস্থাশীল ; ৭। হুকুমকারী প্রভূরূপী নন বরং সুপারিশ কারী ; ৮। উত্তম সহযোগী ; এবং ৯। অন্যের মতামত গ্রহণ ।	১ সৎ ও নিঃস্বার্থপর ; ২। মেধাবী ; ৩। কর্মঠ ও সুদক্ষ ; ৪। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ; ৫। নিরপেক্ষতা এবং ৬। কর্তব্যপরায়ণতা।	১। খোদাভীরুতা ; ২। ন্যায়পরায়ণতা ; ৩। সৎ ও সৎকর্মের প্রতি আস্থাশীলতা ; ৪। ক্ষমাশীলতা ; ৫। সুবিচার ও ইনসাফকারী ; ৬। জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী ; ৭। জনগণের আস্থা ভাজন ; ৮। আত্ম-নিয়ন্ত্রনকারী ; এবং ৯। ইবাদতকারী ও আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী।

উৎস : *জার্ণাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিষ্ট্রেশন*, ভলিয়্যুম.২, নং-১,১৯৯৬,পৃ.৯২ ।

এসব আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সুপ্রশাসকের গুণাবলী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে হযরত আলী (রাঃ)-এর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন সুপ্রশাসককে অন্যান্য সাধারণ গুণাবলীর সাথে সাথে, অবশ্যই হতে হবে খোদাভীরু ও নিয়মিত ইবাদতকারী। মোটকথা প্রশাসক বা নেতার উপরে উল্লিখিত যোগ্যতা অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহ্‌ভিত্তিক হতে হবে। যদি নেতার কোন কাজ কোরআন ও সুন্নাহ্‌-বিরোধী হয় অথবা তাদের মানসিক ও শারিরীক যোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তারা প্রশাসনিক নেতৃত্বে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন এবং জনগণও তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "কখনও এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তঃকরণকে আমি আমার স্বরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করতে শুরু করেছে এবং যার কার্যকলাপ আল্লাহ্‌ তায়ালার সীমা লঙ্ঘন করেছে" (সূরা কাহাফ: ২৮)।

৫. নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার:

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ বলেন: "সর্বোপরি যে জীবন বিধানকে তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাকেও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দিবেন, তাদের (ভয়ের) অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দিবেন, (তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না" (সূরা নূর : ৫৫)। মৌলিক অধিকার বলতে বুঝায় এমন সব অধিকার, যা সমাজের লোক হিসেবে জীবন যাপনের জন্যে একজন মানুষের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। যা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, উচিৎ নয়। এ অধিকারগুলো নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, ব্যক্তির নিজের প্রাণ সংরক্ষণ, তার আজাদী এবং তার ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ অধিকারগুলো যথাযথরূপে সংরক্ষিত না হলে মানুষের মানবিক মর্যাদা অরক্ষিত ও বিপন্ন হতে বাধ্য (জায়দান, ২০০০:৫৭)। শান্তি ও কল্যাণময় শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানুষের ত্রিবিধ নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) এর পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অতুলনীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন: "রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা"।

ক) জীবনের নিরাপত্তা: ইসলাম মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানে বদ্ধপরিকর। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ বলেন : "ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া আল্লাহ্‌ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না। যে অন্যায়ভাবে নিহত হবে, আমি উত্তরাধিকারকে প্রতিকারের অধিকার দান করেছি। অতএব তার হত্যার ব্যাপারে

বাড়াবাড়ি না করাই উচিৎ। নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হবে"(সূরা বনী ইসরাইলঃ ৩৩)।

খ) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং তার অধিকার সংরক্ষণে আল-কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে : "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যে ধন-সম্পদ অর্জন করেছো, যে সম্পদ আমি যমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তার থেকে (একটি) উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো"(সূরা বাকারা:২৬৭)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ "তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে আত্মসাৎ করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্যে এর একাংশকে বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করো না" (সূরা বাকারাঃ ১৮৮)।

গ) মানুষের মান-সম্মান সংরক্ষণঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে (নিয়ে) কোন উপহাস না করে, কেননা এমনও তো হতে পারে যে যাদের (আজ) উপহাস করা হচ্ছে, তারা উপহাসকারী ব্যক্তিদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে। কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারীনীদের চাইতে অনেক ভালো। (আরো মনে রাখবে) একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) একবার ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড় ধরনের অপরাধ। যারা এই আচরণ থেকে ফিরে না আসবে, তারা হবে সত্যিকার যালেম" (সূরা আল হুজুরাতঃ ১১)। মানুষের ইজ্জত-আব্রুর সংরক্ষণের জন্যে আল্লাহ্ অন্যত্র ঘোষণা করেনঃ "হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো (কেননা), কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ, একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরী করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে চাইবে- আর (অবশ্যই) তোমরা একে অত্যন্ত ঘৃণা করো, (এসব ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুল করেন এবং তিনি একান্ত দয়ালু" (সূরা আল হুজুরাতঃ ১২)।

ইসলাম মানুষকে আরো যে সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক) ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ জনগণের ওপর কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যুলুম। আর যুলুম ইসলাম ধর্ম অবিচার বলে মনে করে। এখানে রাষ্ট্র ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার রক্ষার

জন্য দায়িত্বশীল। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে : "তিনি সেই মহান সত্ত্বা, যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর পরতে পরতে চলাফেরা করো, এর থেকে (উদ্‌গত) রেযেক তোমরা আহার করো, (মনে রেখো) একদিন তোমাদের সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে" (সূরা মূলক: ১৫)।

খ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার: ইসলাম সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যাতে তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে পালন করতে পারে তার নিশ্চয়তা প্রদান করে কোরআনের ঘোষণা: "তারা আল্লাহ্ তায়ালার বদলে যাদেরকে ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালিগালাজ করো না, নইলে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহকেও তারা গালি দিবে" (সূরা আনআম: ১০৮)। অন্যত্র বলা হয়েছে : "(হে মুসলমানরা) তোমরা কেতাবধারীদের সাথে কোন রকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য ভাল কিছুর ব্যাপার হলে তা আলাদা কথা, তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে (তাদের কথা আলাদা)" (সূরা আনকাবুত: ৪৬)।

গ) বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা: রসূলে করীম (সাঃ) মানুষের বিবেক ও বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে : "(আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই, (কারণ) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি তাগুত-কে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র (দেয়া জীবনাদর্শের) উপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোন দিনই ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন এবং জানেন" (সূরা বাকারা : ২৫৬)। বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "(হে নবী) তোমার মালিক চাইলে এ যমীনে যত মানুষ আছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। (কিন্তু তিনি তা চাননি, তাছাড়া) তুমি কি জোরজবরদস্তি করে চাইবে যে তারা সবাই মোমেন হয়ে যাক" (সূরা ইউনুস: ৯৯)।

৬. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ:

ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু তথা অমুসলিম নাগরিকদের স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করবে অথবা তার মনোস্তুষ্টি ছাড়া তার কোন বস্তু হস্তগত করবে, ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে (অমুসলিমের পক্ষে) ফরিয়াদি হব। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কোনরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে" (সূরা মায়েদা: ৮)।

৭. পররাষ্ট্র নীতিমালা:

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি রাষ্ট্রকেই অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে:

ক) শান্তি চুক্তিকরণ: বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। আর এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে নানাবিধ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে: "(হে মোহাম্মদ) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহর উপরই ভরসা করবে" (সূরা আনফাল: ৬১)।

খ) প্রতিপক্ষের সাথে আবদ্ধ চুক্তির প্রতি সম্মান : প্রতিপক্ষের সাথে আবদ্ধ চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামী রাষ্ট্রের করণীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন: "যদি কখনো কোন জাতির কাছ থেকে তোমার এ আশংকা হয় যে, তারা (চুক্তি ভঙ্গ করে) বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাহলে তুমিও (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি একইভাবে তাদের (মুখের) উপর ছুঁড়ে দাও। (তবে তোমরা নিজেরা তা আগে লংঘন করো না)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না"(সূরা আনফাল : ৫৮)। বিধর্মীদের সাথে আবদ্ধ চুক্তি রক্ষায় অন্যত্র আল-াহর ঘোষনা হচ্ছে: "মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি তাদের সাথে চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমরা মেনে চলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে পছন্দ করেন"। (সূরা তাওবা: ৪)

৮. প্রশাসনিক জবাবদিহি:

Lord Action বলেছেন- 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.' এজন্য লোক-প্রশাসনে সরকারি আমলাদের নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে যাতে তাঁরা কর্তব্যকর্মে দায়িত্ববান থাকেন (নূর, ১৯৯৮-৯৯)।

জবাবদিহির আভিধানিক অর্থ কৈফিয়ত। অর্থাৎ জবাবদিহি হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারিতে জবাবদিহিকে "A Requirement to give explanations for one's actions" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রশাসনে জবাবদিহি বলতে প্রশাসনে

নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করার সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদান করা বুঝায় (ইসলাম, ২০০০)।

প্রশাসনিক জবাবদিহি সম্পর্কে L.D.White তাঁর '*Introduction to the study of Public Administration*' গ্রন্থে বলেন, জবাবদিহি হচ্ছে, "সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত বিধিমালা ও পূর্ব-দৃষ্টান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত আচরণ যার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের সরকারি কর্মের জন্য জবাবদিহি করা যায় (নূর, ১৯৯৮-৯৯)। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা তথা রাসূল (সাঃ) প্রবর্তিত সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং পরবর্তীতে খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের জন্য তিনভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল (নূর, ১৯৯৮-৯৯):

ক) অধস্তন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করা: ইসলামী প্রশাসনে স্তরভিত্তিক কর্তৃত্ব-কাঠামো অনুমোদিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে মান্য কর, তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং আনুগত্য কর তাঁদের যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে" (সূরা নেসা: ৫৯)। অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাগণ পদক্রম অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকতেন।

খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা: ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হত। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) সাপ্তাহিক জুমার নামাজের সমাবেশে এবং বার্ষিক হজ্বের মহা-সম্মেলনে জনগণকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত প্রশাসক, প্রশাসন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনে উৎসাহিত করতেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ তথায় দাঁড়িয়ে সকল উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। এ জাতীয় একটি ঘটনায় একবার স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ)-কেই ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করার জন্য জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

গ) শেষ বিচারের দিন মহান প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরীণ চেতনাবোধ সমুজ্জল রাখার মাধ্যমে: ইসলামী আকিদার অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে আখিরাত বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পার্থিব জীবনের হিসাব গ্রহণ। আল্লাহ্ বলেন, "প্রত্যেক আত্মাই তাঁর কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে; কেবল তাঁরা ব্যতীত যারা সঠিক পথে পরিচালিত হবে" (সূরা মোদ্দাস্সের: ৩৮-৩৯)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "কোন মানুষই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না এবং মানুষ ঠিক ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে চেষ্টা করবে" (সূরা নাজম: ৩৮-৩৯)। মহান আল্লাহ্ আরও ঘোষণা করেন, "অতএব, যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণও কোন ভালকাজ করবে সেদিন তাও সে দেখতে পাবে ঠিক তেমনি কোন মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে তাও সে দেখতে পাবে" (সূরা যিলযাল: ৭-৮)। কোরআনের এই নির্দেশনাগুলো হলো নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। জাবাবদিহির এই অনুভূতি মানুষ তথা প্রশাসকবৃন্দকে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্রিয় করে তোলে।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সার্বভৌম প্রভূ আল্লাহ্র খলীফা (প্রতিনিধি) হিসাবে সরকারি প্রশাসকগণকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, যার ভিত্তিতে তারা পরজীবনে পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হবেন (আল-কোরআন, ২:২৮১; ৪:৮৭)। পবিত্র কোরআনে ৩৮৪ বার শেষ বিচারের দিবসে জবাবদিহি বা পার্থিব জীবনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মানবজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে (নূর, ১৯৯৮-৯৯)।

খলীফা ওমর (রাঃ) বলেছেন, "সিনাই পর্বতের পাদদেশে কোন মেষপালকও যদি অভুক্ত থাকে, তাহলে সেজন্য খলীফাকে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে (নূর, ১৯৯৮-৯৯)।

৯. ন্যায় বিচার:

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগণ (Founding Fathers of American Independence) স্বাধীন জাতির শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে সরকার গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন:

"Justic is the end of government" অর্থাৎ "ন্যায়বিচারই" হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য (নূর, ১৩৯৬ বাং)। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। "ন্যায়বিচার" বা "সামাজিক ন্যায় বিচার" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী প্রশাসন সামাজিক জীবনে সমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। ইসলামী বিধানের আলোকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন, "আমি রসুলদের প্রেরণ করেছি ন্যায়নীতির কিতাবসহ (পথ

নির্দেশিকা) যাতে মানুষ 'ন্যায়বিচার' কায়েম করে" (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)। আল-াহ আরও বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে" (সূরা নাহল: ৯০)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলছেন, "হে দাউদ ! আমিই তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি জনগণের মধ্যে পরম সত্য, সততা, ও ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা কর" (সূরা ছোয়াদ: ২৬)।

আল্লাহ অন্যত্র আরও বলছেন," হে বনি আদম ! ... বল ! আমার প্রতিপালক নির্দেশ করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার"(সূরা আরাফ: ২৭-২৯)।

একমাত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব। ইসলামী প্রশাসনে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। আইন প্রয়োগে পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ এখানে নেই। অর্থাৎ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় রাজা-প্রজা, মুসলমান-অমুসলমান, আরব-অনারব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বদাই ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব এটা কখনো দেখবে না, কেননা তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ্র অধিকার অনেক বেশী। অতএব তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না" (সূরা নেসা: ১৩৫)।

শাসক-প্রশাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে: "ওয়া সুলতানোল আদিল জিল্লুল্লাহে ফিল আরদে" অর্থাৎ ন্যায় বিচারক শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়াস্বরূপ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,"যে সকল প্রশাসক পৃথিবীতে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, তারা ছাড়া পরকালে বাকীদের জীবন হবে অবমাননাকর (নূর, ১৯৯৮-৯৯)। অতএব বিচারককে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পাদন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, "আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন অবশ্যই সুবিচার করবে (সূরা নেসা: ৫৮)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে; বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ করবে, কারণ এটি তাকওয়ার নিকটতম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন" (সূরা মায়েদা: ৮)।

১০. পরামর্শ-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাঃ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে 'শুরা' বা অংশগ্রহণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা। কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম" অর্থাৎ "তোমরা নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে" (সূরা শুরাঃ ৩৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং হে নবী ! আপনি কাজকর্মের ব্যাপারে লোকদের (সাহাবীদের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর (সেই পরামর্শের ভিত্তিতে) আপনি যে সংকল্প একবার গ্রহণ করবেন, তা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই করে ফেলুন। আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তাঁর ওপর নির্ভরশীল মানুষদের ভাল বাসেন" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)। এই ধারণার বিশেষত্ব হল, এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর প্রভাবের পরিবর্তে সম্মিলিত মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ ব্যক্তি (নেতা) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতমত গ্রহণ করে থাকেন। তবে তা কোন অবস্থায় ইসলামী নীতির পরিপন্থী হতে পারবে না (সিদ্দিকী, ১৯৯৭)। কারণ এ বিষয়ে আল্লাহ্র হুসিয়ারী হচ্ছে,"আর যারাই আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফের, যালেম ও ফাসেক" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪,৪৫,৪৭)।

১১. প্রেষণাঃ

প্রেষণা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা কোন কর্মীকে কোন নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কর্মচারীগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আগ্রহের সাথে কাজ করে তার জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা প্রশাসকের অন্যতম দায়িত্ব। কারণ কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং কর্মপ্রেরণার উপর প্রশাসনিক সংস্থার কর্মনৈপুন্য এবং সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। প্রশাসক কর্তৃক এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করাই হচ্ছে প্রেষণা। সংগঠনের কর্মীদের আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট আচরণ বিজ্ঞানী Douglas Mc Gregor তাঁর *The Human Side of Enterprise* নামক গ্রন্থে' Theory-X এবং Theory-Y নামে দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করেন (রহমান ও ইসলাম, ২০০০) :

ক) Theory-X: সাধারণত লোকেরা কাজ অপছন্দ করে এবং সম্ভব হলে কাজ এড়িয়ে চলে। সুতরাং তাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং বল প্রয়োগ ও ভয়-ভীতির দ্বারা কাজ করাতে হবে। এটি Theory-X নামে পরিচিত।

খ) Theory-Y: লোকেরা কখনও কাজকে অবহেলা করে না এবং কাজ করানোর জন্য তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানোর প্রয়োজন নাই। লোকের মধ্যে সুপ্ত মেধা আছে।

যথোপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা অবশ্যই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। এটি Theory-Y নামে পরিচিত।

McGregor -এর এই তত্ত্ব দুটির প্রেক্ষিতে প্রেষণাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যথা : ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রেষণা, আধুনিক প্রশাসনিক সংগঠনে কর্মীদের প্রেষণা দানে যার প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইসলামও মানুষকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত প্রাপ্তি) পৌঁছে দেবার জন্যে এই উভয়বিধ প্রেষণার চর্চা করে থাকে। যথা-

ক) ইতিবাচক প্রেষণাঃ এইরূপ কার্যক্রমের অধীনে কার্যদক্ষতার জন্য কর্মীদেরকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিক প্রশাসনিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের প্রকৃতি যেখানে আর্থিক (বেতন, বোনাস ইত্যাদি) এবং অনার্থিক (পদোন্নতি, কাজের প্রশংসা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের অংশগ্রহণ, সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি) উভয় প্রকার হয়ে থাকে সেখানে প্রেষণা প্রদানে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে, "অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা এই (নেক) বান্দাদের দুনিয়ার জীবনেও ভাল প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের জন্যে অনেক সুন্দর পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ্ নেককার বান্দাদের ভালবাসেন" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৮)।

"তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী মাত্র, কিন্তু (পুরস্কার হিসাবে) যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সে সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং সর্বাবস্থায়ই তাদের মালিকের উপর নির্ভর করে" (সূরা শুরাঃ ৩৬)।

"(জান্নাতে) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় রাজকীয় (সুসজ্জিত) আসনের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মজুদ থাকবে। তারা যা কিছু চাইবে তাই তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে" (সূরা ইয়াসীনঃ ৫৬-৫৭)।

"আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, যেখানে থাকে পানির নির্মল ফোয়ারা, আছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, আছে পানকারীদের জন্যে সুপেয় নহরসমূহ, আছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) আছে সব ধরনের ফলমূল যেখানে আছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা" (সূরা মুহাম্মদঃ ১৫)।

"(সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের" (সূরা ফাতির: ৩৩)।

খ) নেতিবাচক প্রেষণা: সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন না করলে শাস্তিভোগ করতে হবে-এই মর্মে কর্মীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করার নাম নেতিবাচক প্রেষণা। তিরস্কার বা ভর্ৎসনা, বদলী, চাকরিচ্যুতি, পদাবনতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আল-কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে, "(অপর দিকে) অপরাধীরা হামেশা জাহান্নামে (কঠিন আযাবে নিমজ্জিত) থাকবে। (মুহূর্তের জন্যও) সে (শাস্তি) তাদের থেকে লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে। (এই আযাব দিয়ে কিন্তু) আমি তাদের উপর মোটেই জুলুম করিনি বরং তারাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে" (সূরা যোখরুফ: ৭৪-৭৬)।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "যে ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে তার মালিকের দরবারে হাজির হবে তার জন্যে থাকবে জাহান্নাম (আর জাহান্নাম, এমন এক জায়গা), যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না (আবার বাঁচার মত করে বাঁচবেও না" (সূরা ত্বাহা: ৭৪)। উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লিখিত নির্দেশনা ছাড়াও আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কোরআনের আরও অসংখ্য আয়াতে-কারিমায় এরূপ ইতিবাচক (জান্নাত ও এর নেয়ামত ভোগের সুসংবাদ এবং নিশ্চয়তা প্রদান) এবং নেতিবাচক (জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদর্শন) প্রেষণার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

১২. নৈর্ব্যক্তিকতা:

ম্যাক্সওয়েবারের আদর্শ নমুনার আমলাতন্ত্রের একটি উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নৈর্ব্যক্তিকতা বা নিরপেক্ষতা। তাঁর মতে, আদর্শ কর্মচারী প্রশাসনে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। এখানে প্রশাসক কাউকে ঘৃণা বা আবেগ কিংবা স্নেহের সম্পর্কে জড়াবেন না। তাকে আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচ বিবেচনা না করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি একইরূপ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বদাই ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (এটা কখনো দেখবে না, কেননা) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহর অধিকার অনেক বেশি। অতএব, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না" (সূরা নেসা: ১৩৫)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে; বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ করবে, কারণ এটি তাকওয়ার নিকটতম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন" (সূরা মায়েদাঃ ৮)।

১৩. প্রশাসনিক সংগঠনের নীতিমালাসমূহ:

আধুনিক প্রশাসনের নীতিসমূহের প্রকৃতি ও সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে যদিও তাত্ত্বিকরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি তবুও কম-বেশি তাদের সবাই যে সকল নীতিসমূহের কথা বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো ইসলামের নির্দেশনার আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক) শ্রম বিভাজন

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রম-বিভাজন নীতি অপরিহার্য। একটি সামগ্রিক কাজকে বিভিন্ন এককে বিভক্ত করার নামই হচ্ছে শ্রম বিভাজন। অর্থাৎ স্বতন্ত্র ধরনের কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করার প্রক্রিয়াকে কর্মবিভাগ বা শ্রম-বন্টন বলা হয়। এই শ্রম বন্টনের ভিত্তিভূমি হচ্ছে বিশেষজ্ঞতা। যে ব্যক্তি যে কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাকে পদ ও যোগ্যতা অনুযায়ী সেই কাজে নিয়োগ করতে হবে। মহানবী (সাঃ) তাঁর মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য আল-ওয়ালী, আল-আমিল, আল-কাজী, মুহ্‌তাসিব ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করেছিলেন। রাসুল (সাঃ) তাঁর কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ করে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে এর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

যেমন- ক) যাকাত ও সদকার হিসাব সংরক্ষণ : যুবায়ের বিন আলআওয়াম এবং যুহায়ির বিন আল সালত্।

খ) খেজুর বৃক্ষের কর আদায়: হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান।

গ) রাষ্ট্রীয় হিসাব সংরক্ষণ: মুয়ান কীব বিন-আবী ফাতিমা।

ঘ) বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে যোগসূত্র রক্ষা: মুগীরা বিন শুবা এবং হুসাইন বিন নুমীর

ঙ) সেচ ও আনসারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়: আব্দুল্লাহ বিন আকরাম এবং আলা বিন উকবা (রাঃ)।

এছাড়াও হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, ও আলী (রাঃ) ছিলেন তাঁর (সাঃ) প্রধান উপদেষ্টা। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান। হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) ছিলেন রাসুল (সাঃ)-এর একান্ত ব্যক্তিগত সচিব। ওহী লেখক, বিভিন্ন রাজদরবারের পত্র লেখক, সভাকবি এবং দোভাষীর দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। আর হানযালা বিন আল রাবী রাসূল (সাঃ) এর সীল মোহর সংরক্ষণ করতেন। এছাড়া প্রাদেশিক প্রশাসনকে ১০টি প্রদেশ এবং আঞ্চলিক প্রশাসনকে ২৩ টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সুযোগ্য ব্যক্তিদেরকে যথাক্রমে প্রাদেশিক গভর্নর বা ওয়ালী ও আঞ্চলিক প্রশাসক বা আমিল হিসাবে নিযুক্ত করেন। এতে ইসলামী প্রশাসন পরিচালনায় শ্রম-বিভাজন নীতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খ) পদসোপান

'পদসোপান' শব্দটির মূল কথা হচ্ছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে প্রত্যেক নিম্নতর পদই উচ্চতর পদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর অধীনে থাকে। সংগঠনের কর্মীদের স্তরবিন্যাস হবে উপর হতে নিচে অর্থাৎ কর্মী ব্যবস্থাপনা হবে সিঁড়ির মত। উপর দিকে থাকবেন উর্ধ্বতনরা আর নিচের দিকে থাকবেন অধস্তনরা। উর্ধ্বতনরা (Superior) আদেশ দিবেন আর অধস্তনরা (Subordinate) তা পালনে বাধ্য থাকবেন। পদসোপানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে C.P. Bhambri বলেছেন, "Hierarchy is a system of interlocking superior subordinate relationship from top to bottom" (উদ্দিন, ২০০৪:৮৮) মহানবীর (সাঃ) প্রশাসন ছিল পদসোপান নির্ভর। আল্লাহর আইন বা কোরআনের নির্দেশাবলীকে শিরোধার্য করে প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেছেন স্বয়ং রাসুল (সাঃ)। তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ কর্মরত থাকতেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, "আতিউল্লাহ্া ওয়া আতি উর রসূলু ওয়া উলিল আমরে বাইনাকুম," অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, মান্য কর রাসূলকে এবং নেতৃত্ব মেনে চল তাদের যাদেরকে তোমাদের মধ্য হতে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে (সূরা নেসা: ৫৯)।

ডায়াগ্রাম-১: মহানবী (সাঃ) এর প্রশাসনিক কাঠামো

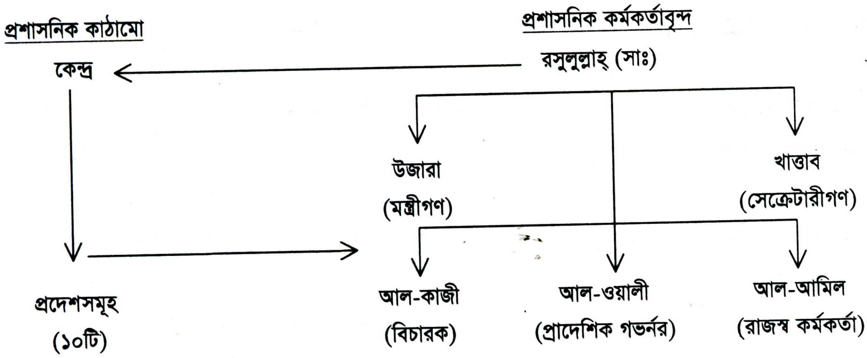

উৎস ঃ *জার্ণাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন*, ভলিয়্যম. ১, নং-১,পৃ. ১১৭।

গ) আদেশের ঐক্য

প্রশাসনিক বিশৃংখলা দূরীকরণ এবং প্রশাসনের উৎকর্ষ আনয়নকল্পে একজন কর্মী কেবলমাত্র একজন নিকটস্থ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করবে। প্রশাসনের কর্মচারীবৃন্দ একজন ব্যক্তির আদেশই মেনে চলবে এবং এই আদেশের অনুবর্তী হয়েই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে। প্রশাসনিক তত্ত্বের এই ধারণাই 'আদেশের ঐক্য' নামে পরিচিত। এই নীতির অন্যতম প্রধান সমর্থক বিখ্যাত লোক প্রশাসনবিদ হেনরী ফেয়ল এর মতে,"আদেশের ঐক্য বলতে বুঝায় একজন কর্মচারী কেবলমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্বের আদেশ গ্রহণ করবেন"(উদ্দিন, ২০০৪:৯৩)।

এক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশনা হচ্ছে,"আল্লাহ্ ব্যতীত কারো আদেশ বা আধিপত্য নাই" (সূরা আলে ইমরান: ১৮৯)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন," তিনিই মহান আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সমস্ত তারিফ তাঁর জন্যে, দুনিয়াতে ও আখেরাতে আইন ও বিধান চলবে একমাত্র তাঁর, তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে" (সূরা কাসাস: ৭০)।

ঘ) কর্তৃত্ব অর্পণ

কর্তৃত্ব অর্পণ নীতি নির্দেশ করে যে, প্রশাসনিক সংগঠনের প্রত্যেক কর্মচারীকেই তার কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অর্পণ করা আবশ্যক। James D. Mooney-এর মতে,"কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নপর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করাকেই কর্তৃত্ব অর্পণ বলা হয়" (ভূইয়া, ১৯৯৯:৫৭)। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব অর্পিত হলে কর্মচারীগণ কি কাজ করতে হবে, কেন

করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারেন। Professor G.R.Terry বলেছেন, "কর্তৃত্ব হস্তান্তর বলতে এক নির্বাহী ইউনিট বা সংগঠনিক ইউনিট হতে অপর নির্বাহী বা সাংগঠনিক ইউনিটের নিকট কর্তৃত্ব প্রদান করাকে বুঝায়" (উদ্দিন, ২০০৪:৯৮)। এই সংজ্ঞা হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কর্তৃত্ব হস্তান্তর কেবল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অধস্তন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত কর্তৃত্বকেই বুঝায় না বরং এটা সংগঠনের নিম্নমুখী (Downward), উর্ধ্বমুখী (Upward), পার্শ্বমুখী (Sideward) বা বাহ্যিক (Outward) হতে পারে। আল কোরআনের নির্দেশের আলোকে প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র প্রশাসনকে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক প্রশাসনে বিভক্ত করে (পূর্বে উল্লেখিত) সুযোগ্য প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের উপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিলেন। এখানে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ একদিকে পদসোপান-ভিত্তিক (উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে অধস্তন কর্তৃপক্ষের নিকট), আবার অন্য দিকে এই কার্যক্রম অনুভূমিক পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল (ডায়াগ্রাম-১)।

ঙ) সমন্বয় সাধন

প্রশাসনে শ্রমবিভাগ ও কার্যবণ্টন অপরিহার্য। যেহেতু প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করে থাকে সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই উক্ত প্রশাসনের কর্মীবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দলীয় সংহতি, ঐক্য ও সহযোগিতা, যা এক কথায়, সমন্বয়সাধন নামে পরিচিত। J.D. Mooney তাই যথার্থই বলেছেন, "সমন্বয় হচ্ছে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে দলবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা" (উদ্দিন, ২০০৪:১০১)। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিচ্ছেন এভাবে, " তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)।

"তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও আল্লাহ্‌ভীতিতে একে অপরকে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে (কখনো) পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা কর না" (সূরা মায়েদা: ২)। আল্লাহ্ আরও বলেন, তোমরা (কখনো) তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের মানুষদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি" (সূরা আলে ইমরান: ১০৫)। আল্লাহ্‌র এ সুস্পষ্ট নির্দেশের অর্থ এই যে, ইসলামী প্রশাসনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রশাসকবৃন্দকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নীতি মেনে চলা অপরিহার্য।

চ) লাইন ও স্টাফ এজেন্সী

কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রধান নির্বাহীর অধীনে দুই ধরনের কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন- একদল কর্মচারীকে লাইন এজেন্সী এবং অপর দল কর্মচারীকে স্টাফ এজেন্সী নামে অভিহিত করা হয়। লাইন এজেন্সী সাধারণত কর্তৃত্ব প্রদান বা আদেশ প্রদানে আর স্টাফ এজেন্সী সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদানে নিয়োজিত থাকেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মহানবী (সাঃ) এর প্রশাসন ব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রশাসনে পদসোপান নীতির ভিত্তিতে যে সকল কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত ছিলেন, যারা আদেশ প্রদানের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চর্চা করার অধিকারী ছিলেন (যেমন খাত্তাব, আল-ওয়ালী, আল-আমীল প্রমুখ) তাঁরা লাইন এজেন্সীর সাথে তুলনীয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সফলতার নিমিত্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল সাহাবী/উজারা বা মন্ত্রীবর্গ (হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী (রাঃ) প্রমুখ) তাঁর উপদেষ্টার পদে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে স্টাফ এজেন্সী হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

ছ) তত্ত্বাবধান

Supervision শব্দটি ‘Super’ এবং ‘Vision’ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত যার অর্থ হচ্ছে ‘Overseeing’ বা তত্ত্বাবধান (Laxmikanth, 2001:103-4)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ‘Supervision’ বলতে বুঝায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন কর্মকর্তার কাজ তত্ত্বাবধান করা বা দেখাশোনা করা। প্রশাসনিক সংগঠনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছেন কি না তা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, সমন্বয় সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান কার্যক্রম সুসম্পন্ন করে থাকেন। মহানবী (সাঃ) ও খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামালে ইসলামী প্রশাসনের প্রশাসকবৃন্দ তথা খলীফা ও ওয়ালীগণ পরিদর্শনের মাধ্যমে অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন (নূর, ১৯৯৮-৯৯)।

উপসংহারঃ

সত্যিকার অর্থে ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণকামী ও উন্নয়নমুখী প্রশাসনের প্রতিচ্ছবি ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনেই প্রতিফলিত হয়। আজকের দিনের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেধাভিত্তিক নিয়োগ, নৈর্ব্যক্তিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, গণজবাবদিহি ও ন্যায়পালের ন্যায় বিষয়াদি আল্লাহ্‌র কোরআনের নির্দেশনার আলোকে আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করে যে ন্যায়ভিত্তিক ও সেবামূলক প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ইসলাম, তা রীতিমত বিস্ময়কর। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন-প্রশাসন সাহিত্যে উন্নয়নের কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণ, সম্পদের পুনর্বণ্টন, সাম্য ও

ন্যায়বিচারের যে দাবি উঠেছে, বহুকাল পূর্বে সে সবের সমাধান নির্দেশ করেছিল ইসলামী প্রশাসন। ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারার আদলে যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা রূপায়ণ করা সম্ভব হয় এবং ইসলামী বিশ্বাস, ধারণা ও সাংস্কৃতিক প্রত্যয়গুলো যদি পুংখানুপুংখভাবে পালন করা যায় তাহলে, আজকের যুগেও ন্যায়ানুগ ইনসাফভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সুখী, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তথ্য নির্দেশিকা

আনিসুজ্জামান, ড. মোহাম্মদ; নূর, আবদুন ও কাদের, ড. আ. ক. ম. আবদুল (১৯৯৮-৯৯). "ইসলামী আইনের (শরীয়া) উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলী", জার্নাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন, ভলিয়্যুম.৪-৫, নং-১, পৃ.৬০-৭৫ ।

আমীন, মুহাম্মদ রুহুল (১৯৯৪), "মদীনা সনদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উজ্জল স্বাক্ষর", ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১২৭-১৩৩ ।

ইসলাম, মোঃ জহুরুল (২০০০)."প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত", লোক প্রশাসন সাময়িকী, ষোড়শ সংখ্যা, পৃ. ১-২৪ ।

উদ্দিন, মোঃ আনসার (২০০৪). লোকপ্রশাসন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ । ঢাকা ঃ অধুনা প্রকাশন ।

চক্রবর্তী, শিবনাথ (১৯৮৫). লোক প্রশাসন পরিচিতি । কলকাতা : আদ্যাশক্তি পাবলিকেশন্‌স, ।

জায়দান, ডঃ আবদুল করিম (২০০০). ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা । ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ।

নূর, আবদুন (১৩৯৬ বাং)."সামাজিক ন্যায় বিচার ও ইসলামী প্রশাসনের রূপরেখা", প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, , পৃ. ১৫-২৪ ।

নূর, আবদুন (১৩৯৭ বাং)."লোক প্রশাসনে নৈতিকতা", প্রশাসন সমীক্ষা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ.১-১৬ ।

নূর, আবদুন ও সিদ্দিকী, জে.ইউ.এম বাবর হোসাইন (১৯৯৫). "মহানবী (সাঃ)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা (৬২৩-৬৩২)", জার্নাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন, ভলিয়্যুম.১, নং-১, পৃ. ১১২-১২৮ ।

নূর, আবদুন (১৯৯৭)."নব লোক প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসন", জার্নাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন, ভলিয়্যুম .৩, নং-১, পৃ. ৯৩-১০০ ।

নূর, আবদুন (১৯৯৮-৯৯)."লোক প্রশাসনে লোক জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক ও ইসলামী পদ্ধতি", জার্নাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিস্ট্রেশন, ভলিয়্যুম.৪-৫, নং-১, পৃ.৭৬-৮৮ ।

বাহাদুর, আমীর মুহাম্মদ নসরুল-হ (১৯৯৬)."পল.এইচ.এপলবি, জাতিসংঘ এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুপ্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী", জার্ণাল অব ইসলামিক এড্‌মিনিষ্ট্রেশন, ভলিয়্যুম.২, নং-১,পৃ. ৮৪-৯৩ ।

ভূইয়া, ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ (১৯৯৯), লোক প্রশাসনের রূপরেখা। ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড, ।

মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা (২০০৩). ইসলাম পরিচিতি। ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের (১৯৯৮). আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা । ঢাকা : এ. কে. প্রকাশনী, ।

মাসিক মদীনা, জুলাই সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ.৫৮ ।

রহমান, এম. শামসুর (১৯৯৩). আধুনিক লোকপ্রশাসন। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রহমান, ডঃ মোঃ আতাউর ও ইসলাম, মোঃ নজরুল (২০০০). সাংগঠনিক আচরণ। ঢাকা : উত্তরা পাবলিকেশনস্ ।

রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর (১৯৯৮). আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার। ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, পৃ. ৯৭।

সিদ্দিকী, জে.ইউ.এস. বাবর হোসাইন (১৯৯৭). "লোক প্রশাসন অধ্যয়নে পাশ্চাত্য ও ইসলামী মডেল : একটি তুলনামুলক পর্যালোচনা", জার্নাল অব ইসলামিক এড্মিনিস্ট্রেশন, ভলিয়্যুম .৩, নং-১, পৃ. ১২১-১৪৪ ।

হক, এ.কে.এম.ফজলুল (২০০১), "সার্বভৌমত্বের ইসলামী ধারণা", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৬৩-১৭৭।

Abdalati, Hammudah (1980). Islam In Focus, Riyadh: The World Assembly of Muslim Youth.23. Buraey, Muhammad-Al (1985). Administrative Development:An Islamic Perspective London & New York : Kegan Paul International Limited.

Bhagwan,Vishnoo & Bhashan, Vidya (1996). Public Administration, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Hart, MIchael H. (1998). The 100 : A Ranking of the most influential persons in the History, New york : Hart Publishing.

Hashim, Abul (1990). The Creed of Islam, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Jabnoun, Naceur (1994), Islam and Management, Kuala Lumpur: Institute Kazian Dasar, p.123.

Laxmikanth, M. (2001). Public Administration, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd, p.1.

Muslim, Syed Naquib (1999). The Art of Modern Administration, Dhaka: BIAM Publications, p. 46.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

সুশাসন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(Good Governance: A Theoretical Analysis)

*শাহনাজ পারভীন**

Abstract: The terms governance and good governance are increasingly being used in development literature. Governance describes the process of decision-making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Hereby, public institutions conduct public affairs, manage public resources, and guarantee the realization of human rights. Good governance accomplishes this in a manner essentially free of abuse and corruption, and with due regard for the rule of law. Good governance defines an ideal which is difficult to achieve in its totality. However, to ensure sustainable human development, actions must be taken to work towards good governance. Major donors and international financial institutions, like the IMF or World Bank, are increasingly basing their aid and loans on the condition that reforms ensuring good governance are undertaken. Main objective of this paper is to discuss about the theoritical aspects of governance as well as good governance.

ভূমিকা:

উন্নয়নের (development) একটি পদ্ধতি হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে সুশাসনের (good governance) ধারণাটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। আশির দশকে সাব-সাহারান আফ্রিকায় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সুষ্ঠু উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সমার্থক হিসেবে সুশাসনের ধারণাটি চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুত সুশাসন হল শাসন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা। রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হলেও সুশাসনে ব্যক্তিখাত ও সিভিল সোসাইটির অংশীদারিত্ব জরুরী। শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহি, কার্যকারিতা, সমতা, দায়িত্বশীলতা ও ঐকমত্য সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুষ্ঠু ও দক্ষ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সুশাসনের সমার্থক। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমে শাসন প্রক্রিয়া ধারণাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে সুশাসনের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে।

শাসন প্রক্রিয়া: ধারণা ও পরিধি

শাসন প্রক্রিয়া (governance) প্রত্যয়টি বহুমাত্রিক। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারণার ন্যায় শাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাত্ত্বিকগণের মাঝে সুস্পষ্ট কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মূলত উন্নয়ন ডিসকোর্সে রাষ্ট্রের যথাযথ ভূমিকা কি হতে পারে এই

* প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), মানবিক বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পর্কিত বিতর্কে শাসন প্রক্রিয়া প্রত্যয়টি এত উদারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, এটি একটি সর্বব্যাপী (ubiquitous) প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে রাজনৈতিক ও একাডেমিক ডিসকোর্সে সুদীর্ঘ সময় ধরে সরকার পরিচালনার কার্যব্যবস্থা বোঝানোর প্রসঙ্গে ধারণাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে *The Oxford English Dictionary* (১৯৬১) শাসন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে:

- The action or manner of governing;
- The office, function or which something of governing;
- The manner in which something is governed or regulated (Oxford Dictionary, 1962 : 319)

কিন্তু শাসন প্রক্রিয়া প্রত্যয়টি বর্তমান উন্নয়ন চর্চায় শুধুমাত্র সরকারের নিবার্হী বিভাগের ক্ষমতাচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং উন্নয়নের একটি দৃষ্টিভঙ্গী (development approach) হিসেবে প্রত্যয়টি বিগত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে বিকশিত হয়েছে (Cheema, 2000 : 518)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে ১৯৫০ এর দশকের শেষ দিক হতে ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত উন্নয়ন চিন্তা রষ্টোর 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পর্যায়' (stage of economic growth) ধারণাকে ঘিরে আবর্তিত হতো (Rostow, 1960: 5) কিন্তু ১৯৬০ এর দশকের শেষার্ধে এবং ১৯৭০ এর দশকের প্রারম্ভে পরিলক্ষিত হয় যে প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সমর্থ হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নেতৃত্বে উন্নয়নের মৌলিক চাহিদা দৃষ্টিভঙ্গি (basic needs approach) প্রবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে জনগণ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় (ILO, 1976: 20)।

১৯৭০ এর দশকের শেষভাগে এবং ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে বৈশ্বিকভাবে প্রবৃদ্ধির ধীরগতি ও ঋণ সংকট দেখা দিলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বব্যাংক (World Bank) ও আইএমএফ (IMF) উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য 'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি' (Structural Adjustment Program –SAP) প্রণয়ন করে। এ কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নশীল বিশ্বে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণসহ মৌলিক সেবাগুলোতে সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায় দারিদ্র হ্রাস হবার পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় (জনপরিসর , ২০০২ : ৮)।

১৯৮০ এর দশকে সাব-সাহারান আফ্রিকায় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর বিশ্বব্যাংক তাদের Sub-Saharan Africa : From Crisis to

Sustainable Growth : A long Term Perspective Study (১৯৮৯) শীর্ষক অনুসন্ধানী গবেষণাকর্মে উন্নয়নের সংকটকে শাসন প্রক্রিয়ার সংকট (crisis of governance) হিসেবে চিহ্নিত করে (The World Bank, 1989: 2)। এ সময়ই বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতার প্রশ্নে শাসন প্রক্রিয়ায় বৈধতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি ইস্যুকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর এভাবেই উন্নয়ন সহযোগিতার একটি দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে শাসন প্রক্রিয়া প্রত্যয়টি বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয় এবং এর অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম অভিমত ব্যক্ত করে যে, একটি জাতির কার্যক্রম পরিচালনায় কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা হয় সেটিই হচ্ছে শাসন প্রক্রিয়া। পরবর্তীতে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে *Governance and Development* (১৯৯২) শীর্ষক পুস্তিকায় শাসন প্রক্রিয়ার নিম্নোক্ত তিনটি উপাদানকে চিহ্নিত করে:

- The form of political regime (Parliamentary or presidential, military or civilian and authoritarian or democratic);
- The process by which authority is economic and social resources; and
- The capacity of governments to design, formulate and implement policies, and, in general, to discharge government functions (The world Bank, 1992 : 1).

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক শাসনের সংকটের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ Commission on Global Governance শীর্ষক একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করে। *Our Global Neighborhood* (১৯৯৫) নামক রিপোর্টে কমিশন শাসন প্রক্রিয়া প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করে বলে:

> Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and cooperative action may be taken it (Commission on Global Governance, 1995: 2).

ইনষ্টিটিউট অন গভর্নেন্স এর মতে শাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া এবং ঐতিহ্য, যা নির্ধারণ করে কিভাবে ক্ষমতার চর্চা হয়, কিভাবে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং জনগণের অভিমত ব্যক্ত হয় (Johnson, 1997 : 3)। আর এভাবেই শাসন প্রক্রিয়ার ধারণায় শুধুমাত্র সরকারি কর্মকাণ্ডই নয় বরং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টদেরকে সংযুক্ত করা হয় আবার ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টেফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) তাদের Capacity

Building for Governance (১৯৯৭) শীর্ষক মনোগ্রাফে অভিমত প্রকাশ করে যে-

> Governance means more than government; it refers to a political process that encompasses the whole society and contributes to the making of citizens, active contributors to the social contact that binds them together (Cheema, 2000: 517).

অপরদিকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অভিমত প্রকাশ করে যে, শাসন প্রক্রিয়া হল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিত সেখানে নাগরিকগণ নিজেদের মাঝে এবং সরকারের সাথে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে (Johnson, 1997: 13)। ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) তাদের *Governance for Sustainable Human Development* (১৯৯৭) শীর্ষক পুস্তিকায় শাসন প্রক্রিয়াকে টেকসই মানব উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করে বাখ্যা করে। UNDP এর মতে শাসন প্রক্রিয়া হল:

> The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions, through which citizens and groups articulate their interests, exercises their legal rights, meet their obligations and mediate their differences (UNDP, 1997: 3).

ইউএনডিপি'র মতে, শাসন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয় যেখানে রাষ্ট্র (states), ব্যক্তিখাত (private sector) এবং সিভিল সোসাইটি (civil society) দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য সহায়ক আইনগত কাঠামোর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিষ্ঠা করবে যা টেকসই মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। (Aminuzzaman, ২০০৬ : ১৫)।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার পাশাপাশি তাত্ত্বিকগণও শাসন প্রক্রিয়া ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী William W. Boyer এর মতে, শাসন প্রক্রিয়া হল সরকারি কর্মকাণ্ড এবং এর সাথে বেসরকারি অংশীদারদের একটি মিথস্ক্রিয়া যা শাসনের প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি এবং জননীতি সম্পর্কে উভয়ের যৌথ সম্পর্ক নির্দেশ করে (Boyer, 1990: 51) । আবার ল্যান্ডেল মিলস ও সেরাজিলদিন এর মতে, শাসন প্রক্রিয়া হল জনগণ কিভাবে শাসিত হয়, কিভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কিভাবে তা জনপ্রশাসন ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে (Landell-Mills and Serageldin, 1991: 304)।

অনুরূপভাবে নগর শাসন প্রক্রিয়া (urban governance) বিশেষজ্ঞ কানডার ম্যাককারনী (McCarney), তানজেনিয়ার হাফানী (Halfani) এবং চিলির রডরিগেজ (Rodriguez) প্রমুখ এর মতে, শাসন প্রক্রিয়া এর ধারণা সরকার হতে পৃথক, এটি রাষ্ট্র এবং সিভিল সোসাইটি, শাসক এবং শাসিত, সরকার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। শাসন প্রক্রিয়ার বিষয়াদী সরকার ব্যবস্থা, কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রতিনিধিত্বের ধরন এবং সরকারি কাঠামোর দায়িত্বশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করে যা সরকার ও সিভিল সোসাইটির মধ্যে একটি স্বাধীন ও বৈধ সম্পর্ক নিশ্চিত করে (McCarney, 1995:95)। আবার রবার্ট মিলার তাঁর *The Ecology of Governance* (১৯৯৬) শীর্ষক রচনায় শাসন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন (Johnson, 1997: 3). গোরান হাইডেন শাসন প্রক্রিয়াকে একটি সর্বব্যাপী ধারণা (umbrella concept) হতে তুলনামূলক রাজনীতির একটি পদ্ধতি হিসেবে কতিপয় প্রস্তাবনা চিহ্নিত করেছেন যা নিম্নরূপ :

- Governance is a conceptual approach that, when fully elaborated, can frame a comparative analysis of macro-politics;

- Governance is a national concept, emphasising the nature of interactions between state and social actors, and among social actors themselves;

- Governance refers to particular types of relationships among political actors: that is, those which are socially sanctioned rather than arbitrary (Governance @ gdre.org, 2003: 5)

অধ্যাপক রেহমান সোবহান শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নকে এক ও অবিচ্ছেদ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি *Reprioritizing south Asia's Development Agenda : The Role of Governance* (১৯৯৮) শীর্ষক মনোগ্রাফে অভিমত প্রকাশ করেন যে, Governance is an institutively process, which influence the outcome of public policies. In this definition as well governance is recognized as an integral to development (মামুন, ১৯৯৯ : ৬৫)। আবার শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (CPD)- এর উদ্যোগে পরিচালিত Independent Review of Bangladesh Development-IRBD শীর্ষক গবেষণাকর্মে এম এম আকাশ শাসন প্রক্রিয়ার একটি প্রায়োগিক ও সরল মডেল উপস্থাপন করে বলেন, শাসন প্রক্রিয়া হল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তা বা সরকার কর্তৃক বীক্ষণ বা স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি চেষ্টা (Hye, 1998: 2) এই মডেলের

কেন্দ্রীয় পূর্বানুমান হচ্ছে, রাষ্ট্র অর্থনীতিতে নিম্নতম ভূমিকা রাখার পরিবর্তে একটি সক্রিয় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সচেষ্ট। মডেলে অন্তর্ভুক্ত বীক্ষণ বা স্বপ্ন (vision), অঙ্গীকার (commitment) এবং সামর্থ্য (capacity) এই তিনটি চলকের আন্তঃ সম্পর্কের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

চিত্র-১, বীক্ষণ, অঙ্গীকার এবং সামর্থ্যের আন্তঃসম্পর্ক

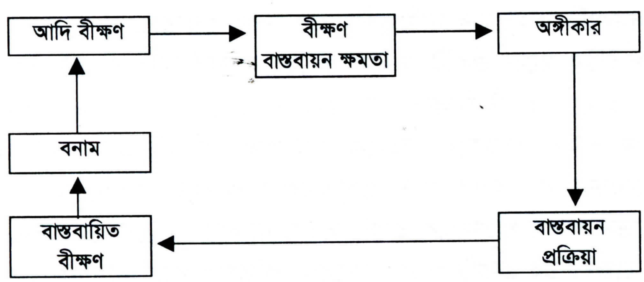

উৎস : আকাশ, এম. এম, শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন : পারস্পারিক সম্পর্ক " সোবহান, রেহমান (সম্পাদিত), অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট: বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৭, ঢাকা: সিপিডি ও ইউপিএল, ১৯৯৮, পৃঃ ৪৮।

অপরদিকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের (LGRD) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে ঢাকায় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে হাসনাত আব্দুল হাই শাসন প্রক্রিয়া ধারণাটির একটি conceptual framework প্রদান করে ব্যাখ্যা করেন যে ধ্রুপদি রাষ্ট্রে (conventional state) সরকার, আইনসভা ও বিচারবিভাগ রাষ্ট্রের অন্তঃস্থ উপাদান এবং স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিখাত ও সিভিল সোসাইটি বহিঃস্থ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে, পুনঃসংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রে (redefined state) সরকার, আইনসভা এবং বিচারবিভাগের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিখাত ও সিভিল সোসাইটি ক্ষমতা চর্চার অন্তঃস্থ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত (Hye, 2000: 2)। হাই -এর মতে, শাসন প্রক্রিয়া হল:

> The undertaking of activities, management of resources, organization of men and women by groups of people, communities local government bodies, business organizations and the branches of the state (legislature, judiciary and government) through social political, administrative and economic arrangements that meet the daily needs of people and ensure sustainable development (Hye, 1998 : 2).

সাব-সাহারান আফ্রিকায় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক শাসন প্রক্রিয়ার ধারণাটিকে উন্নয়ন অনুশীলনের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সাহিত্যের তাত্ত্বিকগণও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুতরাং উপর্যুক্ত বহুমাত্রিক আলোচনার সূত্রে বলা যায় যে, শাসন প্রক্রিয়া হল এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের সকল পর্যায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সরকার, ব্যক্তিখাত ও সিভিল সোসাইটির অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়।

সুশাসন: অর্থ ও প্রকৃতি

উন্নয়নের একটি দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে শাসন প্রক্রিয়ার ধারণাটির অন্তর্নিহিত ও মৌল তাৎপর্য হল সুশাসন (good governance)। বস্তুত দুর্বল শাসন প্রক্রিয়ার (weak Governance) উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুশাসনের অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সুশাসনের অর্থ ও প্রকৃতি নির্ণয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের *Governance and Development* (১৯৯২) শীর্ষক পুস্তিকায় সুশাসনকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে যে, good governance is synonymous with sound development management. সুশাসনের অর্থ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের ব্যাখ্যায় প্রধানত সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতাই গুরুত্ব পেয়েছে যেখানে দুর্বল শাসন প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে :

- Failure to make a clear separation between what is public, and what is private, hence, a tendency to divert public resources for private gain;
- Failure to establish a predictable framework of law and government behavior conducive to development, or arbitrariness in the application of rules and laws;
- Excessive rules regulations, licensing requirements and so forth, which impede, the function of markets and encourage rent-seeking;
- Priorities inconsistent with development, resulting in a misallocation of resources;
- Excessively narrowly based or nontransparent decision making (world Bank, 1992: 1-9).

আবার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA) শাসন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি (accountability), স্বচ্ছতা (transparency), আইনের শাসন (rule of

law) এবং অংশগ্রহণ (participation) এ চারটি মৌল বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিকে সুশাসন হিসেবে নির্দেশ করেছে (Johnson, 1997: 7)। অপরদিকে নয়া বিশ্বব্যবস্থা, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ, খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার ইস্যু, যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের প্রসার প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক সুশাসন (global good governance) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত Commission on Global Governance এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *Our Global Neighborhood* (১৯৯৫) শীর্ষক প্রতিবেদনে বৈশ্বিক সুশাসনের প্রশ্নে নির্দিষ্টভাবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়:

- সুশাসন হল পরিবর্তন এবং বহুমাত্রিক মুল্যবোধের সাথে মানিয়ে চলা;
- বাস্তবসম্মতভাবে নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা উপলব্ধি করা;
- জাতিসংঘের সংস্কার করা এবং
- বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন জোরদার করা (Commission on Global Governance, 1995 : 2)।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি -এর মতে, সুশাসন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারসমূহকে সমাজের বৃহত্তর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়। পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য সম্পদসমূহের বণ্টনে দরিদ্র ও অসহায়দেরকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা হয়। ইউএনডিপি-এর মতে সুশাসনের জন্য—

শাসন প্রক্রিয়ায় *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability Ges strategic vision* থাকা জরুরী (UNDP 1997: 6-7)। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং দাতাগোষ্ঠীর ন্যায় দেশি-বিদেশি তাত্ত্বিকগণও সুশাসনের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাখ্যা করেছেন। ল্যান্ডেলমিলস এবং সেরাজিলদিন সুশাসনের কিছু মৌল বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছেন যার অন্যতম হল:

- Political accountability (through credible electoral process);
- Freedom of association and participation;
- A sound judicial system;
- Bureaucratic accountability and transparency in the management of public funds ;
- Freedom of information and expression;
- Capacity building in the public sector (landell mills and serageldin, 1991: 15-16).

আবার জি. বিলনে *Good Governance and Participatory Development in Australia's Aid Program (1994)* শীর্ষক মনোগ্রাফে সুশাসনের একটি সামগিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে সুশাসন হল: The effective management of a country's social and economic resources in a manner that is open, transparent, accountable and equitable (Bilney, 1994: 16)। অপরদিকে লিনজ এবং স্টিপেন সুশাসন বিষয়ক নিম্নোক্ত আটটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত কাঠামোর কথা বলেছেন:

- একটি শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি;
- একটি স্বশাসিত রাজনৈতিক সমাজ;
- আইনের শাসন;
- একটি দক্ষ ও দায়িত্বশীল আমলাতন্ত্র;
- একটি অর্থনৈতিক সমিতি ;
- জন সংহতিমূলক ব্যবস্থা;
- একটি বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা; এবং
- একটি অবাধ গণমাধ্যম (খান, ২০০১: ৫০)।

সুশাসন বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সুশাসনের অন্যতম লক্ষ্য হল উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মূলতঃ Structural Adjustment Policy এর ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেই টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি গুরুত্ব লাভ করেছে যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resource) এবং সেবাসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক উপাদানসমূহকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে *The World Commission on Environment and Development* তাদের *Our Common Future (1987)* শীর্ষক রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাতটি কৌশল নির্ধারণ করে যা নিম্নরূপ:

- Reviving growth ;
- Changing the quality of growth ;
- Meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation;
- Ensuring a sustainable level of population;
- Conserving and enhancing the resources base;
- Reorienting technology and managing risk; and
- Merging environment and economics in decision making (WCED, 1987:43).

আবার, ১৯৯৭ সালের *The State in a Changing World : World Development Report (1997)* শীর্ষক বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রতিবেদনে সুশাসন ও উন্নয়নকে বিশ্বব্যাংক ব্যাখ্যা করে বলে good governance fosters strong state capable of sustained economic and social development and institutional growth. সুতরাং উন্নয়নের একটি দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে সুশাসনের অন্তর্নিহিত বিষয় হল শাসন প্রক্রিয়ায় সরকার, ব্যক্তিখাত এবং শক্তিশালী সিভিল সোসাইটির কার্যকর ও যৌথ অংশদারিত্ব সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা, স্থায়িত্বশীলতা, তথ্য প্রবাহের অবাধ স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, যোগ্যতার ভিত্তিতে বণ্টন এবং একটি কৌশলগত লক্ষ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার:

উন্নয়ন অনুশীলনে সাব-সাহারান আফ্রিকায় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের সংকটকে শাসন প্রক্রিয়ার সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, যা কিছু অনুন্নয়ন ও নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা তার মূলে রয়েছে শাসন প্রক্রিয়ার সমস্যা ও অকার্যকারিতা। এক্ষেত্রে শাসন প্রক্রিয়া হল উন্নয়নের জন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদসমূহের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ক্ষমতার চর্চা। অপরদিকে শাসন প্রক্রিয়ায় দক্ষতায়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, সমতা ও অংশগ্রহণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থিত থাকলে তা সুশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ করে তোলে। কোন কোন উন্নয়ন সংস্থা সুশাসনকে টেকসই মানব উন্নয়নের (sustainable human development) অপরিহার্য শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং সুশাসন হল উন্নয়নের লক্ষ্যে শাসন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং সুষ্ঠু ও দক্ষ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সুশাসনের সমার্থক।

তথ্যসূত্র :

Bilney, G. (1994). "Good Goverance and Participatory Development in Australia's Aid Program", in Development Bulletin, Vol. 32.

Boyer, William. W. (1990). "Political Science and the 21st Century: From Government to Governance", in PS: Political Science and Politics, Vol. XIII, No. 1.

Cheema, G. Shabbir (2000). "A Governance Approach to Development: New Role for Development Co-operation", in Hye, Hasnat Abdul (ed.), Governance: South Asian Perspectives, Dhaka: University Press Limited.

Commission on Global Governance (1995). Our Global Neighbourhood, New York: Oxford University Press.

Hye, Hasnat Abdul (2000). "Good Governance: A Social Contract for the New Millennium", in Hye, Hasnat Abdul (ed.), Governance: South Asian Perspectives, Dhaka: University Press Limited.

Hye, Hasnat Abdul (1998). "Good Governance", Concept paper presented at the International Conference on Good Governance, jointly organized by Local Government Division, Ministry of LGRD and Co-operatives, Government of Bangladesh and United Nations Development program, Dhaka, August 4-6.

International Labour Organization (1976). Employment, Growth and Basic Needs: A One World Approach, Geneva: International Labour Organization.

Johnson, Isabille (1997). "Redefining the Concept of Governance", Toronto: Canadian International Development Agency, Mimeo.

Landell- Mills, Pierre and Serageldin, Ismail (1991). "Governance and the External Factors", in Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington DC: The World Bank.

Landell- Mills, Pierre and Serageldin, Ismail (1991). "Governance and Development Process", in Finance and Development, Washington DC: The World Bank.

Mc Carney, *et.al.* (1995). Towards An Understanding of Governance: The Emergence of an Idea and its Implication for Urban Research in Developing Countries", in Stern, Richard and Bell, Judith, Kjellberg (eds.), Urban Research in Developing World, Vol. 4, Perspective on the city Toronto: Center for Urban and Community Studies, University of Toronto.

Rostow, W.W. (1960), The Stage of Economic Growth, New Haven: Yeal Press.

Salahuddin, M. Aminuzzaman (2006). Governance and Development: An Overview", in Salahuddin, M. Aminuzzaman, (ed.). Governance and Development: Bangladesh and Regional Exeriences, Dhaka: Shrabon Prokashani.

The Oxford English Dictionary (1961). New York: Oxford University Press.

The World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term Perspective Study, Washington DC: The World Bank.

The World Bank (1992). Governance and Development, Washington DC: The World Bank.

World Commission for Environment and Development (1987). Our Common Future, New York: Oxford University Press.

খান, মোহাম্মদ, আবুল বাশার (২০০১). "সুশাসন ও উন্নয়নের পারস্পারিক সম্পর্ক ঃ পীর যাত্রাপুর গ্রামের একটি তৃণমূল সমীক্ষা", অপ্রকাশিত এমএসএস থিসিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সরকার ও রাজনীতি বিভাগ।

জনপরিসর (২০০২). সংখ্যা-১, এপ্রিল, ঢাকা

মামুন, মুনতাসীর (১৯৯৯). দক্ষিণ এশিয়ায় শাসন ঃ বাংলাদেশে সুশাসন, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-৭৬।

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১৪/নভেম্বর-২০০৭

নারী উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমীক্ষা: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, ইস্যু ও সমস্যাসমূহ

(A Study on Women development and Microcredit Programme: Issues and Problems)

*মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন**

Abstract: Bangladesh is one of the developing countries in the world. Half of its population is women. Now the time has really come for women to build their own future Changes in gender roles and relations are not easy to achieve, the process is incremental. The prevailing socio economic, cultural, political and even the natural situation is not favourable to be make women economically solvent. The government and both the local and international Ngos working in the country have undertaken several initiatives to eliminate gender imbalance. The government and different non-government organizations have already taken several schemes for women to increase employment facilities. They have already established a good reputation in developmental activities especially for women. The present paper attempts to picturize the hard realities of the conditions of women preaviling in the country, effects and consequences on micro credit loan and the issues and problemswhich are commonly facing to women. We hope that the results of this article will be helpful to give effective guidance for the government and Ngos who are responsible and engaged in employment generating activities for women.

ভূমিকা:

শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অবহেলা ও অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে সুষম সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের অংগীকার নিয়ে বর্তমান শতাব্দী এগিয়ে চলছে। বর্তমান শতাব্দীর মূল বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিক জেন্ডার-সমতাভিত্তিক সমতা গড়ে তোলা। কিন্তু নারীর অনুন্নত অবস্থা বা জেন্ডার বৈষম্য আজ বিশ্বের জন্য একটি অভিশাপ। আজও সারা বিশ্বে নারী পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে শোষিত ও নিগৃহীত।

পুরুষশাষিত সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। সমাজ ও দেশ গঠন কাজে

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

তাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে তাকে স একজন মানুষ হিসেবে পুরোপুরি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। একবিংশ শত পদার্পণ করে সারা বিশ্ব যখন দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে তখন নারীকে ি পড়তে হচ্ছে পর্যাপ্ত উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাবে।

সারা বিশ্বে প্রায় ৬১০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হল নারী। এতদ বিশ্বের ৭০% নারীই আজ দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জরিত।[১] উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা নারীকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নয়নে অংশগ্রহণ নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারী উন্নয়ন কে তরান্বিত করে। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার ি করে না বরং এর মাধ্যমে নারীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হয় এবং নারী-অ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

উন্নয়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থে এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলত উন্নয় Development কে কোন সর্বজনীন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। World এর World Development Report (১৯৯১) এ বলা হয়েছে, "Develop never will be, and never can be defined to universal satisfaction.[২]"

Edward W. Weidner বলেন, Development as a process of growth i direction of modernity and particularly in the direction of nation bui and socio-economic progress[৩].

উন্নযন হল উৎকর্ষের পথে এক পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রতিটি মানুষ এবং একইসাথে সামগ্রিক দিক। উন্নয়ন একটি বহুমুখী ধারণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়কে একত্রিভূত "উন্নয়নে নারী- এ নীতিতে বলা হয়, নারীরা তাদের দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জড়িত নয়, কাজেই তাদের অবস্থা দিনে দিনে অধস্তন হচ্ছে। নারীরা যদি কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়, তবে নারী-পুরুষের এই অসম অবস্থান আর থাকবে

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন প্রচেষ্ঠার ধারায় নারীউন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহু ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রি মূল স্রোতধারার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে নারী উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্ব প আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অধিকাংশ মহিলা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত। অথচ চরম দারিদ্য, বঞ্চনা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেকারত্ব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীল জাতি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাথে নারীসমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও উৎপাদনমুখী কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। দেশের দ্রুত ও সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ সত্যকে উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তর দেশের মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য নারীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী তথা আত্ম-নির্ভরশীল করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা এবং পারিবারিক ও সমাজ জীবনের যে কোন কর্মকাণ্ডে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও লক্ষণীয়। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে তাদের অনগ্রসরতা কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ সকল সংস্থাসমূহ গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করতে সচেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের সেই প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে বা এ কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে তা জানা প্রয়োজন।

সমস্যার বর্ণনা ও গবেষণার গুরুত্ব:

শুধু বাংলাদেশেই নয়, অগ্রসরমান বিশ্বের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যপূর্ণ একটি সমাজ ব্যবস্থাই দৃশ্যমান হয় যেখানে সম্পদ, মর্যাদা, ক্ষমতা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সম-অধিকারের প্রসঙ্গটি অবহেলিত হয়ে আসছে। এ বঞ্চনা, রাষ্ট্র, সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি অত্যন্ত সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানের উন্নতি হলেও তাদের অবস্থানগত অর্থাৎ মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের পথ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত হয়নি। কিন্তু সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন প্রত্যাশা করা কল্পনাপ্রসূত। তাই সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আর উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে নারীর যেমন সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে, তেমনিভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ভারসাম্য বিরাজ করবে এবং উন্নয়ন তরান্বিত হবে। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র

নারীর যে উপকৃত হবে তা নয়, বরং এর মাধ্যমে পুরুষ ও তার উপর অর্পিত অতিরি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাবে। সুতরাং নারী উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মা সম্পদে পরিণত করে সমাজ, রাষ্ট্র তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে আর সমৃদ্ধ করার জন্য নারী উন্নয়নকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশের মহিলারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে অনেক পশ্চা রয়েছে। পুরুষের শিক্ষার হার যেখানে ৫৫ % সেখানে মহিলা শিক্ষার গড় হ ৩৮.৭০%। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান যেখ প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি পরিম খাদ্যের যোগান দিতেও সক্ষম নয়। অপুষ্টিজনিত কারণে নারী ও শিশু মৃত্যুর হার অ অত্যধিক। নারী নির্যাতনের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই কাজে পারিশ্রমিকে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। বাংলাদেশের নারীরা বিশেষত গ্র মহিলারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পত্তির মালিকানা, মজুরী বেতন, প্রশিক্ষণের সুযোগ ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে নী নির্ধারণের সুযোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। ফলে, দে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলারা যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। যদিও গত ক দশক এসব সমস্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত রয়ে তবুও নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা ও প্রতি সংক্রান্ত বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের সঠিক গ প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামীণ মহিলাদের অর্থকরী কাজে নিয়োগ এ দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি "অন্ধকারে ঢাকা" এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়ো রয়েছে। দূর্ভাগ্যক্রমে ১৯৭৪ এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের জাতীয় শুম মহিলাদের অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গৃহস্থালীর কাজ বলে সংজ্ঞায়িত ক মাধ্যমে প্রথমত এ অন্ধকারকে আরো গভীরতর করে তোলে। দ্বিতীয়ত অর্থকরী ক মহিলাদের অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারটা বৈশিষ্ট্যগতভাবে পুরুষ অংশগ্রহণ থেকে ভিন্ন। তৃতীয়ত গ্রামীণ মহিলাদের ধ্যান-ধারণা, আচরণ, ই অনিচ্ছা, অর্থকরী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি সম্প ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশেষত গ্রা নারীদের দারিদ্র্য মোচনে এনজিওর ভূমিকা নিয়ে নানা মত বিদ্যমান। এনজি প্রবক্তাগণ নারী উন্নয়নে এনজিওর কৌশল ও কার্যক্রমকে অধিকতর বাস্তবসম্মত ফলদায়ক বলে বিবেচনা করেন। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে গ্রা নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এনজিওসমূহ ইতিবাচক ভূমিকা প

করছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহয়োগিতা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তৃণমূল পর্যায়ের নারী জনগোষ্ঠীর বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বহু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র্য মোচনে এনজিওর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্নতা বিদ্যমান।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্যবলী:

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে- নারী উন্নয়নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান; নারী উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল; নারী উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রভাব ও ফলাফল জরীপ; নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু ও সম্যাস্যাসমূহে নারীদের মনোভাব যাচাই; এবং নারী উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ চহ্নিতকরণ এবং সুপারিশ প্রণয়ন।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

নারী উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রভাব ও ফলাফল জরীপ করার জন্য বিভিন্ন এনজিও কাছ থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছে এমন ৯৬ জন গ্রামীণ মহিলাদের নিকট থেকে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ঋণের প্রভাব, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ,জীবন যাত্রার মান, ব্যয়ের ধরন, স্বাস্থ প্রসঙ্গ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন বয়সের, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পদের চাকরিজীবীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

নারী উন্নয়ন:

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী । এ অবস্থায় নারীরা পুরূষের মুখাপেক্ষী। নারী-পুরুষের বৈষম্য পুরুষশাসিত সমাজে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের থাকেনা কোন বিশেষ অধিকার। আর এজন্যই প্রয়োজন নারী উন্নয়ন। নারীর উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান সুযোগ প্রদান, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিতকরণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা, সংসারে নারীদের মতামত বা সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার প্রদান, ধর্মিয় কুসংস্কার পরিবর্তন করে নারীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, পুরুষতান্ত্রিক মনমানসিকতার পরিবর্তন করা- এ জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা।

নারীউন্নয়ন হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা অর্জন এবং নারীকে তা ক্ষমতার বিষয়ে পূর্ন সচেতন করে তোলা, নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সকল স্ত কার্যকরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে অব্যাহত উন্নয়নে নারীর অবদান বৃদ্ধি করা , উৎপাদ কর্ম সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও প্রযুক্তি, ক্রিয়া, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধা প্রণেতা, অংশগ্রহণকারী এবং সুবিধা ভোগকারী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণই হচ্ছে না উন্নয়ন ।

ক্ষুদ্রঋণ:

দরীদ্র, ভুমিহীন, শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও মূলধন গঠনের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে মাধ্যমে ক্ষমতাহীন নারী ও পুরুষকে ক্ষমতাবান করে গড়ে তোলা ক্ষদ্রঋণ এ উদ্দেশ্য । দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দি প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তা দান এবং মনিটর করা হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম । ঋ গ্রহীতারা যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারেন । ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকের দ্বারে ধর্না দিবে না বরং ব্যংকিং সুবিধা নিয়ে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার দ্বারে যাবেন । প্রত্যন্ত গ্রাম এলাক ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকিং সুবিধা পৌছে দেয়া এবং তাদের অর্থনৈতি উন্নতি বিধানের সাথে সাথে তারা যাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখ পারে- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য এটাই ।

নারী উন্নয়নের পটভূমি:

শোষণ, নিপীড়ন, অবহেলা, অবিচার প্রভৃতি নেতিবাচক প্রত্যয়ের সাথে নারী সমাজে পরিচয় আবহমান কালের । সময়ের পথপরিক্রমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় মু আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য চাপে ঔপনিবেশিক সাম্রাজের পতন, জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভ সর্বোপরি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা নারী সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । এ ছাড়া বিশ্বব্যাপি ক্রমবর্ধমান না অধিকার আন্দোলনের প্রভাবে জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশ বহুদশক ধ মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে উত্থাপিত হওয়া বিভি সমঝোতা অনুসরণ করে আসছে ।

মূলত, ১৯৪৬ সালে বিশ্বে নারীর অবস্থান মূল্যায়নের জন্য জাতিসংঘ ক Commission of the status of women' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক পরিস

নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টার সূচনা ঘটে। আর এ কারণে উক্ত কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। সে সময় থেকেই বিশ্ব বিবেকের প্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত বিশ্ব নারী-সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

১) মেক্সিকো সম্মেলন (জুন-জুলাই, ১৯৭৫)

২) কোপেন হেগেন সম্মেলন (জুলাই ১৯৮০)

৩) নাইরোবি সম্মেলন (জুলাই ১৯৮৫)

৪) জার্কাতা ঘোষণা (১৯৯৪)

৫) বেইজিং সম্মেলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)

এছাড়া বিভিন্ন সনদ ও কনভেনশন ইতিপূর্বে সূচিত নারী আন্দোলন বা নারী উন্নয়নকে তরান্বিত করে। এ সকল সনদ ও কনভেনশনের মধ্যে সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন-১৯৫২ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ব পেক্ষাপট:

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর গৃহিত সনদে বলা হয়- One of the preconditions of fundamental human rights is to ensure equality between male and female." (The UN charter, 1945, Art. 12)

এরপর ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে জাতিসংঘ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হল-

- ১৯৪৫ সালে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান জানার জন্য ECOSOC একটি কমিশন গঠন করে যার নাম দেয়া হয় Commission on the status of women.
- ১৯৪৬ সালে কমিশনের প্রথম বৈঠকের বিশ্বে নারীর অগ্রগতির জন্য নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৪৮ সালে Human Rights Declaration এর অধীনে এর ২ নং ধারায় নারী উন্নয়নে নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়।
- ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ অধিবেশনে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য একটি খসড়া ঘোষণা উত্থাপন করে।

- ১৯৭৩ সালে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সনদ তৈরীর জ সদস্যের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।
- ১৯৭৪-২০০০ সাল এর মধ্যে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর লক্ষ্যে নারী বর্ষ হিসেবে ১৯৭৫ সালকে ঘোষণা দেয়া হয় এবং বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রথম নারী-সম্মেলন: ১৯৭৫ সালে (১৯ জুন-২ জুলাই) মেক্সিকোতে প্রথম বি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যার লক্ষ্য ছিল ১৯৭৬-৮৫ দশককে নারী দিবস ঘোষনা পাশাপাশি 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্মেলনে Mexico Pl Action গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব নারী-সম্মেলন: ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে কোপেন হেগেনে দ্বিতী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যার লক্ষ্য ছিল প্রথম সম্মেলনে গৃহিত পরিকল্পন বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ও পরবর্তি ৫ বছরের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ক

তৃতীয় বিশ্ব নারী-সম্মেলন-(১৯৮৫): ১৯৮৫ সালের ১৫-২৩ জুলাই কে নাইরেবি ৩য় বিশ্ব নারী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যার লক্ষ্য ছিল পূর্বে অনুষ্ঠি সম্মেলন ও নারী দশকের পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ও ২০০০ সাল সময়ের জন্য উন্নয়ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

চতুর্থ বিশ্ব নারী-সম্মেলন-(১৯৯৫): ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত বেইজিং ঘোষণায় উন্নয়নে Platform for Action গ্রহণ করা হয় এবং এ সম্মেলনে নারীর অবমাননাকরা ১২টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করো তা সমাধানে কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ হয়। এছাড়া ২০০০ সালে Beijing +5 সম্মেলন নিউওয়ার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন:

সত্তর দশকে 'উন্নয়নে নারী' (Women in Development) নীতিমালার উদ্ভব গবেষকগণ বিভিন্ন তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে, ষাট এবং সত্তর দশকে উন্নয়নের পুরুষের তুলনায় নারীরা ভোগ করেছে অনেক কম। অনেকক্ষেত্রে নারীদের আরও শোচনীয় হয়েছে। উন্নয়নে নারী ও নারী এবং উন্নয়ন এ দুটো নীতি সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আশির দশকে জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালার ঘটেছে আশির দশকে। জাতিসংঘের আওতাধীন থেকে ১৯৭১ সালে বাংলা স্বাধীনতার পর এ যাবৎকালে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে উন্নয়নের লক্ষ্যে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠি

তাতে গৃহিত Platform for Action কে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এভাবে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে নানাবিধ পদক্ষেপ।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঘোষিত ও গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে সে সকল উদ্যোগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

MWCA প্রতিষ্ঠা: জাতিসংঘ-রাষ্ট্রসমূহের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৯০ সালে একে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে নামকরণ করা হয়।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি: ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিমালার যে সকল বিষয় প্রাধান্য পায় তা হল-

- নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন
- মেয়ে-শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন
- নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ
- স্বশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
- জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সম-অধিকার নিশ্চিত করণ
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
- নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- গৃহায়ন ও আশ্রয়
- নারী ও পরিবেশ
- নারী ও গণমাধ্যম
- বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

জাতীয় পর্যায়ে আরও যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল:

National Council for Women Development (NCWD-1997)
Parliamentary Standing Committee for MWCA.
Women's Development Implementation and Evaluation Comm
WID Focal Points Mechanism
MWCA & Its Implementing Agencies.
WID coordinating Committee at the District and Thana level.

এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজমগুলি নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে।

বেইজিং PFA বাস্তবায়ন: Beijing PFA এর ২০২ নং para তে বলা Goverments and other actors should promote an active and visible of mainstreaming a gender perspective in all policies and proga (Beijing PFA, Para, 202)

এ আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ ব নিম্নরূপ:

টাস্ক ফোর্স গঠন: NAP তৈরীর জন্য সরকার ১৯৯৫ সালে ডিসেম্বরে MW সহায়তায় আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করে।

কোর গ্রুপ গঠন: টাস্ক ফোর্সকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালের জ মাসে কোর গ্রুপ গঠন করা হয়।

Sectoral Need Assessment Team গঠন: PFA এর ১২টি Sectoral Asses এর critical area এর সমস্যা গুলি খুঁজে বের করার জন্য ১৯৯৬ সালের আগস্ core Group এর সহায়তায় MWCA এর উদ্যোগে চাহিদা নিরূপন কমিটি হয়। এর কাজ ছিল ১২টি প্রধান মন্ত্রণালয়ের WID Focal Point 'র দুর্বলত বের করে তা সমাধানের সুপারিশ করা।

NAP অনুমোদন: চাহিদা নিরূপণ কমিটির কাজের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যার লক্ষ্য হল

১) জাতীয় উন্নয়নের ধারায় নারী উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্তি;
২) নারী সমাজকে উন্নয়নের সম-অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা;
৩) সম-অধিকারের আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বা দূর করা;
৪) সমাজ ও পরিবারে নারী-উন্নয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করা

IR-WID প্রতিষ্ঠা: বিদেশী ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় সরকার উন্নয়নে নারী বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৯৫ সালের শেষে ৯টি পর্বে এ প্রক্রিয়ার অনুশীলন চলেছে।

জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ: MWCA কে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে Technical Assistance for Gender Facility এবং Institutinal Support for the Implementation of the National Action plan প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া, Policy leadership and Advocacy for Gender Equality (PLAGE) গঠন করা হয়েছে নারী উন্নয়নে MWCA কে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। এভাবে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যাসমূহে নারীদের মনোভাব জরীপ (উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী উপস্থাপন)

সারণি-১ : উত্তরদাতাদের বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার(%)
২০-৩০	২২	৫৫
৩১-৪৫	১০	২৫
৪৬-৫০(+)	৮	২০
মোট	৪০	১০০

দেখা যাচ্ছে যে, মোট ৪০ জন (মহিলা) উত্তর দাতার মধ্যে ২০-৩০ বছরের বয়সসীমা ২২ জনের, ৩১-৪৫ বছর বয়স ১০ জনের এবং ৪৬-৫০এর বয়স ৮ জনের এবং বয়সের শতকরা হার যথাক্রমে ৫৫%, ২৫% ও ২০%।

সারণি-২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার(%)
এইচ.এস.সি	১২	৩০
স্নাতক	১৮	৪৫
স্নাতোকোত্তর	১০	২৫
মোট	৪০	১০০

এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট ৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যত এইচ.এস.সি ১২ জন, শতকরা হার ৩০%, স্নাতক মোট ১৮ জন, শতকরা হার ৪৫ এবং স্নাতকোত্তর ১০ জন এবং মোট শতকরা হার ২৫% ।

সারণি-৩ : উত্তরদাতাদের পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার(%)
ছাত্রী	১৪	৩৫
চাকুরী	২১	৫২.৫
গৃহিনী	৫	১২.৫

উত্তরদাতার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১৪ জন, চাকরি জীবী ২১ জন এবং গৃহিনী ৫ জন এদের শতকরা হার যথাক্রমে ৩৫%, ৫২.৫% এবং ১২.৫% ।

সারণি-৪ : উত্তরদাতা চাকুরি জীবীদের পদমর্যাদা

চাকরির শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রথম	১	৪.৭৬
দ্বিতীয়	৫	২৩.৮
তৃতীয়	৯	৪২.৮৪
চতুর্থ	৬	২৮.৫৬

সারণিতে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রথম শ্রেণীর চাকরি জীবীর সংখ্যা ১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী জন, তৃতীয় শ্রেণী ৯ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিজীবী ৬ জন এবং চাকরিজীবীদে শতকরা হার যথাক্রমে ৪.৭৬%, ২৩.৮%, ৪২.৮৪% এবং ২৮.৫৬% ।

সারণি-৫ : উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার(%)
বিবাহিতা	২৯	৭২.৫
অবিবাহিতা	১১	২৭.৫
মোট	৪০	**২৮.৫৬**

মোট ৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা ২৯, জন অবিবাহিতার সংখ ১১জন, এবং এদের শতকরা হার যথাক্রমে ৭২.৫% এবং ২৭.৫% ।

সারণি-৬ : নারী উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল মূল্যায়ন

ইস্যু ও সমস্যাসমূহ	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ			
১.রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে ।	০১(২.৫%)	১২(৩০%)	২৭(৬৭.৫%)
২.রাজনীতিতে অংশগ্রহনে নারীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আগ্রহী ।	২০(৫০%)	১৫(৩৭.৫%)	০৫(১২.৫%)
৩.রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে পরিবার তথা পিতা, স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের পক্ষ থেকে বাধা পরিলক্ষিত হয় ।	২২(৫৫%)	০৭(১৭.৫%)	১১(২৭.৫%)
৪.নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্য বর্তমান সরকার কতৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যাপ্ত ।	১৭(৪২.৫%)	০৫(১২.৫%)	১৮(৪৫%)
৫.নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সনাতণী ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম বাধা ।	১৩(৩২.৫%)	১৮(৪৫%)	০৯(২২.৫%)
প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ			
৬.প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহনে ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাই প্রধান ।	১৯(৪৭.৫%)	০৯(২২.৫%)	১২(৩০%)
৭.সংসার ও চাকুরী এ দুয়ের মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধন করে দক্ষ নির্বাহী বা সুগৃহীণী রূপে গড়ে উঠা অনেক কষ্টসাধ্য ।	২৭(৬৭.৫%)	১২(৩০%)	০১(২.৫%)
৮.সরকারী ইতিবাচক পদক্ষেপ ও নীতি সত্বেও সিভিল সার্ভিসে সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ত নিশ্চিত করতে পারেনি ।	২৫(৬২.৫%)	০৮(২০%)	০৭(১৭.৫%)
৯.মহিলা নির্বাহীগন পুরুষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা , সহকর্মী ও অধস্তনদের নিকট থেকে সহযোগিতার অভাব বোধ করেন ।	৩০(৭৫%)	০৮(২০%)	০২(০৫%)
১০.সরকারী চাকুরীতে নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং প্রসূতী পরবর্তীকালীন ছুটির সংক্ষিপ্ততা ।	২১(৫২.৫%)	০৭(১৭.৫%)	১২(৩০%)
সামাজিক দৃষ্টিকোণ			
১১.উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার অপর্যাপ্ততা প্রধান অন্তরায় ।	৮০(৮০%)		২০(২০%)
১২.ধর্মীয় বিধি বিধান ও মূল্যবোধ নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে ।	১৫(৩৭.৫%)	০৭(১৭.৫%)	১৮(৪৫%)
১৩.চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীরা অবহেলিত ।	৩৪(৮৫%)	০২(০৫%)	০৪(১০%)
১৪.ফতোয়াবাজী ও সামাজিক কুসংস্কার নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক ।	২০(৫০%)	১০(২৫%)	১০(২৫%)
১৫.নারী শিক্ষার প্রতি সমাজের সদস্যদের অবহেলা প্রকট ।	২৭(৬৭.৫%)	০৫(১২.৫%)	০৮(২০%)
অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ			
১৬.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা স্বাবলম্বী নয় এবং পুরুষ সদস্যর উপর নির্ভরশীল ।	২৩(৫৭.৫%)	১১(২৭.৫%)	০৬(১৫%)
১৭.নারীরা একই ধরনের পদে বা কর্মে অধিষ্ঠিত থেকে পুরুষ অপেক্ষা কম মজুরী পেয়ে থাকে ।	২৮(৭০%)	০৬(১৫%)	০৬(১৫%)
১৮.সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী অংশগ্রহনে হার সন্তোষজনক নয় ।	২৫(৬২.৫%)	১১(২৭.৫%)	০৪(১০%)
১৯.নারীর সামগ্রিক কর্মকান্ড সেটা পরিবার বা সমাজসেবা মূলক যাই হোক না কেন তার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রয়োজন ।	৩৪(৮৫%)	০৬(১৫%)	
২০.নারী উন্নয়নে সরকারী সদিচ্ছার অভাব ।	২৮(৭০%)	০৫(১২.৫%)	০৭(১৭.৫%)

অগ্রসর নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পভুক্ত ৪৮ জন মহিলার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাদের সবাই ছিলেন বয়োপ্রাপ্ত মহিলা। ২৬-৩৫ বছর বয়সের উত্তরদাতা মহিলার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (৩৩.৩৩%) এবং ৩৬-৪৫ বছর বয়সের মহিলার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম (১৬.৬৭%)। বৈবাহিক অবস্থা হলো অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় যা মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তরদা মহিলারা কেউই অবিবাহিত ছিল না। বিবাহিত মহিলার সংখ্যাই ছিল অধিক ৪৩ জ (৮৮.৫৮%)। অপরদিকে বিধবা মহিলা ৩ জন (৬.২৫%) এবং তালাকপ্রাপ্ত মহি ২ জন (৪.১৭%)। শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে এমন মহিল সংখ্যাই অধিক, ২৩ জন (৪৭.৯২%), স্কুলে যায়নি এমন মহিলার সংখ্যা ২০ জ (৪১.৬৭%) এবং মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা ৫ জ (১০.৪২%)।

পেশা ও দক্ষতা:

প্রকল্পভুক্ত এলাকার নারীরা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারী বেশি (৬০.৪২%)। কৃষিকাজ করে এমন মহিলা (১০.৪২% ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত মহিরা (২২.৯২%) এবং গৃহস্থালীর ঝিয়ের কাজে নিয়োজি মহিলা (৬.২৫%)। উত্তরদাতা নারীদের বিভিন্ন বিশেষায়িত কাজের দক্ষতা রয়েছে এর মধ্যে নকশী কাঁথা তৈরী এবং বিড়ি তৈরীর কাজেই অধিক সংখ্যক (১৬.৬৭% দক্ষ। কোন কাজে দক্ষতা নেই তাদের সংখ্যা ৩২ জন (৩৩.৩৩%)।

ঋণ গ্রহণের কারণ:

ঋণগ্রহণ এবং অর্থ উপার্জনকারী কাজ করতে আগ্রহী হবার পেছনে কারণ হিসে ৮৭.৫% উত্তরদাতা পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার বিষয় উল্লেখ করে। এ মহিলাদের শতকরা ৫৬ জনের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান। এদের সকলে বিবাহিতা কিন্তু পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের স্বামীদের আয়-উপার্জন খুবই সামান্য। কিছু কিছু নারীর স্বামী বা পিতার মৃত্যু, তালাক, বিচ্ছেদ, (সন্ত সহ/ব্যতীত) বা স্বামীর অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বে সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় স্বামী বা পিতার মৃত্যুতে অর্থাৎ পরিবারের একম উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে এসব দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের চরম অর্থনৈতিক সংকে মধ্যে পড়তে হয়। অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় নারীরা সমিতি থে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং আয়-উপার্জনকারী কর্মে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক লাঘবের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাসিক আয় ঋণ প্রকল্পের প্রভাব:

প্রকল্প হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ মহিলার (৮৫.৪২%) পরিবারের মাসিক আয় ২০০০-৩০০০/- এবং মাত্র ৪.১৭% উত্তরদাতা নারীর মাসিক আয় ছিল ৩০০ ৪০০০/- টাকা। প্রকল্পভুক্ত হবার পর অর্থাৎ বর্তমানে ৩৯.৫৮% মহিলার মাসিক

২০০০-৩০০০ টাকা। ৩০০১-৪০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় উপার্জনকারীর শতকরা হার হচ্ছে ১২.৫০% যেখানে পূর্বে এ হার ছিল মাত্র ৪.১৭%। ৮.৩৩% মহিলা বর্তমান আয় ৪০০০-৫০০০ টাকা । পূর্বে এ আয়-গ্রুপে কোন নারীকে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায় ঋণগ্রহণ নারীদের মাসিক আয়ে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সারণি-৭ : প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

ঋণের ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
কৃষি জমির সার ক্রয়	৮	৮.৩৩
জমি কট/ দাদন	৬	৬.২৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	২২	২২.৯১
সেলাই মেশিন ক্রয়	১২	১২.৫
গরু ছাগল ক্রয়	৬	৬.২৫
ঘর নির্মাণ	৮	৮.৩৩
শাক সব্জীর চাষ	৪	৪.১৭
রিকসা/ভ্যান ক্রয়	১৪	১৪.৫৮
মেয়ের বিয়ে বাবদ	৪	৪.১৭
ধান ভানা	৪	৪.১৭
টিউবওয়েল ক্রয়	৪	৪.১৭
লেট্রিন স্থাপন	৪	৪.১৭
মোট	**৯৬**	১০০

প্রাপ্ত ঋণ খরচ করলেও একথা সত্য যে তাদের মধ্যে (৮.৩৩%) এর স্বাস্থ্য-সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই তারা বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউওবয়েল এবং স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। উপরন্তু যৌতুক নামক যে সামাজিক ব্যাধি গ্রামীণ মহিলাদের উপর চেপে বসেছে তাতে ৪.১৭% মহিলার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান বাবদ প্রাপ্ত খরচ করার প্রবণতা খুবই সামান্য বলে এ অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে তাদের কেউ কেউ স্বামী/ছেলের জন্য ভ্যান বা রিক্সা ক্রয় করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্বল্প পুঁজি সরবরাহ করে, সেলাই মেশিন ক্রয় করে নানাভাবে মাসে কিছুটা বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে

পেরেছে। এতে করে দারিদ্র্য না ঘুচলেও মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম স
হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সন্তানদের শিক্ষা ও ঋণ প্রকল্পের প্রভাব:

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে প
উচিৎ কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৮১.২৫% মহিলার হ্যাঁ-সুচক জবাব দেন, ১২.
মহিলা না-সূচক জবাব দেন। তারা বলেন ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজে ব্যস্ত থ
হয়, তাছাড়া ছেলেরা কিছু উপার্জন করে সংসারের প্রয়োজন মিটায়। ৬.২৫%
কোন মন্তব্য করেননি। ঋণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর উত্তর দাতা মহিলাদের
৬০.২৪% এর সন্তানরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং অধ্যয়ন করছে
এর হার ছিল ৫৬.২৫%।

ঋণ প্রাপ্তিই আয় বৃদ্ধির কারণ:

বেসরকারি উদ্যোগ থেকে ঋণ পাওয়ার কারণে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে
৭৭.০৮% উত্তরদাতার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৪.৫৮% উত্তরদাতার আ
পায়নি। ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। প্রকল্প-ঋণের উপকারিতা স
সকল উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। ১৬ জন (১৬.৬৭%)
সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সা
মর্যাদার অন্য কোন স্তরে উন্নীত হতে না পারলেও দৈনন্দিন আয়ে একটি স্বল্প
বাড়তি সংযোজন পূর্বের তুলনায় পরিবারে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা আনয়ন ক
ঋণ প্রাপ্তির অর্থ ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ফলে অ
বর্তমান আয় আগের তুলনায় বেড়েছে, সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে, খাবারের মান
পাচ্ছে। তাদের মধ্যে ২৪ জন (২৫%) এর পরিবারের সদস্যগণ সপ্তাহে
একদিন হলেও মাছ/গোস্ত এর মত আমিষ খেয়ে থাকেন বলে জানান।

সারণি-৮ : উৎপাদনশীল কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	৩২	৩৩.৩৩
অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	৬৪	৬৬.৬৭

প্রকল্পের ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি ঋণের যথপোযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত
সংগঠন বিভিন্ন হস্তকর্মে প্রকল্পভুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উত্তরদাতাদের
অপ্রশিক্ষিত সদস্যের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য হারে কম (৬৬.৬৭%)। পক্ষ

মাত্র এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত মহিলারা প্রাপ্ত ঋণ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে সে বিষয়ে অধিকাংশ (৬৬.৭%) নারীই প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। ফলে, তারা উৎপাদনশীল খাতে অর্থ বিনিয়োগ করলেও অদক্ষতার কারণে প্রত্যাশিত অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। সদস্যদের যখন ঋণ প্রদান করা হয় তখনই শুধু কি কাজে তারা ঋণ গ্রহণ করেছে তা দেখা হয়। ঋণ পাপ্তির পর সদস্যরা তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করল কি না পরবর্তীতে তা জোরালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। কারণ সমিতির সংশ্লিষ্টতা মূলত ঋণের কিস্তি সময়মত সংগ্রহ করা, সদস্যরা প্রশিক্ষিত হলো কিংবা বিনিয়োগকৃত ঋণের লভ্যাংশে থেকে তারা ঋণ পরিশোধ করছে কি না সেটি তাদের নিকট তেমন বিবেচ্য বিষয় নয়।

উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ:

ঋণ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৮৫%) উপার্জিত অর্থ গৃহস্থালীর দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষত খাবার ও পোশাক বাবদ ব্যয় করে এবং অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক (৫%) তাদের আয়ের সিংহভাগ সন্তানসন্ততির লেখাপড়া বাবদ ব্যয় করে থাকে বলে জানায়। মহিলাদের উপার্জিত অর্থ নিয়ন্ত্রণে তাদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর না হলেও অন্তত গ্রামীণ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি ততটা প্রতিফলিত হয়নি। শতকরা ৫৬.২২% মহিলার তাদের উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং শতকরা ৩৩.৩৩% এর আয় তাদের স্বামীরা নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছে যে, তাদের আয় কম ও অনিয়মিত হওয়ায় তাদের অভিভাবকরা তাদের উপার্জিত অর্থ ইচ্ছামত খরচের অনুমতি দিয়েছেন। শতকরা ১০.৪২% মহিলার উপার্জনের উপর তাদের পিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে জানায়। অধিকাংশ মহিলাই যারা নিজেদের উপার্জন নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাদের অভিভাবকও রয়েছে তারা জানায় যে, কিভাবে তাদের উপার্জিত অর্থ খরচ করা হবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিয়ে থাকে।

সারণি- ৯ : উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণকারী	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিজে	৫৪	৫৬.২৫
স্বামী	৩২	৩৩.৩৩
পিতা	১০	১০.৪২
মোট	৯৬	১০০.০

এর পেছনে দুটো কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত অভিভাবকরা এ বিষয়ে নি যে, মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থের সর্বাংশ বা বেশিরভাগ গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষ পেছনেই ব্যয় করবে, নিজের জন্য নয়। দ্বিতীয়ত কোন বিবাহিত মহিলাই তাদের পিতা-মাতার পরিবারের জন্য ব্যয় করছে না। একজন পুরুষ অভিভাবক ঘট সংক্ষেপে এভাবে বর্ননা করে, 'আমার স্ত্রী খুব বেশি রোজগার করে না। কাজেই তাকে তা তার কাছেই রাখতে দেই। তবে সে তা পরিবারের জন্যই খরচ করে থ

সারণি- ১০ : সামাজিক মর্যাদার উপর আয়-উপার্জনের প্রভাব

সামাজিক মর্যাদা	পরিবার	শতকরা (%)	পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে	শতকরা
পরিবর্তন হয় নাই	৭০	৭২.৯২	৭৮	৮১.২৫
বেড়েছে	২৪	২৫.০০	১২	১২.৫০
কমেছে	০২	২.০৮	০৬	৬.২৫
মোট	৯৬	১০০	৯৬	১০০

পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে মহিলাদের আয় উপ কোন ধরনের ভূমিকা রাখে তা মূল্যায়ন করা হয়। ব্যক্তি হিসেবে মহিল বাকস্বাধীনতা, যাতায়াতের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামাজিক মর্যাদার হিসেবে মূল্যায়নের জন্য যাচাই করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য প্রত্যাশার বিপরীত বিষয়ই যায় অধিকাংশ মহিলাই জানায় যে, তাদের উপার্জন তাদের পরিবারে (৭২.৯২% প্রতিবেশীদের (৮১.২৫%) মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থানের বা মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেনি। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেন, আয় উপার্জ বলে আমি বিশেষ বা আলাদা ব্যবহার পাই না। আমার স্বামীই সব কিছুর ম আমার মতামতের কোন মূল্য নেই। কেউ কেউ জানায় যে, যদিও তারা ত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বা পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিশেষ ব্যবহার বা মর্যাদা লাভ করে না, তবুও তারা তাদের উপার্জন দিয়ে যে অভিভাবকদের সাহায্য কীরতে পারছে, তা তাদের মধ্যে নিজেদেরকে প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভাবার মত একটা অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

যখন তারা তাদের উপার্জন দিয়ে তাদের পরিবারের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ছেলেমেয়েদের ছোট খাটো বায়না মেটাতে পারে তখন তারা আনন্দ ও তৃপ্তি অ করে বলে জানায়। কিছু কিছু মহিলা জানায় যে, পরিবারে (২৫%) ও প্রতিবেশীদের (১২.৫%) মধ্যে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব মহি উপার্জন গৃহস্থালীতে একটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করেছে। তাছাড়া

কারো কারো ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে। এ কারণেই হয়তো তাদের সামাজিক মর্যাদার অনুকূল পরিবর্তন এসেছে।

পেশাগত সন্তুষ্টি:

ধান সিদ্ধ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জির কাজ বা কৃষি কাজের মত মহিলাদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৬০.৪২%) পেশাগত সন্তুষ্টির ব্যাপারে ইতিবাচক জবাব দিয়েছে । এর কারণ হিসেবে তাদের মতামত হলো : "একেতো আমরা গরীব, অন্যদিকে অশিক্ষিত, কাজেই সন্তুষ্ট না হয়ে উপায় কি? তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির আগে এর চেয়েও কষ্টকর জীবনযাপন করতাম এবং বর্তমানে আয় সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।" অবশিষ্ট মহিলারা (৩৯.৫৮%) তাদের কাজের উপর সন্তুষ্ট নয়। এর কারণ হলো উক্ত কাজে তাদের আয়ের পরিমাণ খুবই কম। এসব মহিলাদের অধিকাংশই কোন-না-কোন বিশেষায়িত হস্তকর্মে নিয়োজিত। যেমন :- নকশী কাঁথা তৈরী, পাটের হস্তশিল্প বা কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী ইত্যাদি। আর তিনজন মহিলা যারা তাদের নিজ গ্রামের ভিতর ও বাহিরে গৃহ পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত তারাও আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এই কাজের নিম্ন মর্যাদার কারণে সন্তুষ্ট নয়।

প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ:

উত্তরদাতাগণ ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা এর জবাবে ৭২.৯২% না সূচক, ১৮.৭৫% হ্যাঁ সুচক, ৮.৩৩৫ মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয় বলে যে সকল মহিলা মত প্রকাশ করেন তাদের যুক্তি হলো ২০০০-৩০০০ টাকা দিয়ে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। টাকার পরিমাণ আরো অধিক (অন্ততপক্ষে ৫-১০ হাজার টাকা) হলে যে সমস্ত পেশায় তারা নিয়োজিত রয়েছে তা ভালভাবে পরিচালনা করে অধিক উপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

যে সমস্ত মহিলারা (১৮.৭৫%) ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তারা বলেন, বেশি পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে প্রত্যাশা অনুযায়ী লাভ না হলে ঋণের কিস্তি দেয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করার মত অন্য কোন সম্পদ বা আয়ের উৎস নেই তাই বর্তমানে দেয় পরিমাণকেই পর্যাপ্ত বলে মনে করে। তাদের যুক্তি হলো, "কম পরিমাণ ঋণ নিব, আস্তে আস্তে পরিশোধ করার পর প্রয়োজনে পুনরায় নিব।" ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা সে বিষয়ে ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেননি।

জীবনযাত্রার মান:

উত্তরদাতা মহিলাদের জমির মালিকানা, বাসগৃহের অবস্থা, খাবার পানির উৎস, লে সুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনযাত্রার মানের অবস্থা বিবেচনা ক হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৪৭.৯২%) মহিলা ১ বিঘার কম পরিমাণ জ মালিক। অপরদিকে ৩০৪ বিঘা পরিমাণ জমি রয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা সবচে কম (২.০৮%)। মহিলাদের অধিকাংশের (৭৭.০৮%) বাড়িতে কাঁচাঘর। ম ৮.৩৩% মহিলার বাড়িতে পাকাঘর আছে এবং ৮.৩৩% মাহিলার বাড়ীতে পাকা আছে এবং ১৪.৫৮% মহিলা আধাপাকা বাড়িতে বসবাস করে। অধিক সংখ (৫০.০০% ও ৪.১৬%) মহিলারা জানায় তাদের খাবার পানির উৎস হ টিউবওয়েল। উত্তরদাতা মহিলাদের ৪৭.৯২% ল্যাট্রিন সুবিধা ভোগ করে এ ১৬.৬৬% মহিলা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। জীবনযাত্রার মানের বর্তম অবস্থা দারিদ্র্যমুক্ত স্বচ্ছল জীবন কাঠামোর ইংগিত বহন করে না। উত্তরদাতাদে অধিকাংশই (৬৬.৬৭%) ভূমিহীন বা ১ বিঘার কম জমির মালিক। প্রকল্প-ঋণ তাদে জীবনধারণ কাঠামোয় তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। (সারনি-৯)

সারনি-১১: ঋণ-গ্রহিতাদের জীবন যাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান		উত্তরদাতা	
		গণসংখ্যা	শতকরা (%)
জমির মালিকানা	ভূমিহীন	১৮	১৮.৭৫
	১ বিঘার কম	৪৬	৪৭.৯২
	১-২ বিঘা	২৪	২৫.০০
	২-৩ বিঘা	০৬	৬.২৫
	৩-৪ বিঘা	০২	২.০৮
বাসগৃহ	কাঁচা	৭৪	৭৭.০৮
	আধাপাকা	১৪	১৪.৫৮
	পাকা	০৮	৮.৩৩
খাবার পানির উৎস	কুয়া	৪৪	৪৫.৮৩
	টিউবওয়েল (সাধারণ)	৫০	৫০.০০
	টিউবওয়ের (একক)	০২	৪.১৬
লেট্রিন	না	৩৪	৩৫.৪২
	হ্যাঁ	৪৬	৪৭.৯২
	মন্তব্য নেই	১৬	১৬.৬৬

জীবনযাত্রার মান:

উত্তরদাতা মহিলাদের জমির মালিকানা, বাসগৃহের অবস্থা, খাবার পানির উৎস, লে সুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনযাত্রার মানের অবস্থা বিবেচনা ব হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৪৭.৯২%) মহিলা ১ বিঘার কম পরিমাণ জ মালিক। অপরদিকে ৩০৪ বিঘা পরিমাণ জমি রয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা সবচে কম (২.০৮%)। মহিলাদের অধিকাংশের (৭৭.০৮%) বাড়িতে কাঁচাঘর। ম ৮.৩৩% মহিলার বাড়িতে পাকাঘর আছে এবং ৮.৩৩% মাহিলার বাড়ীতে পাকা আছে এবং ১৪.৫৮% মহিলা আধাপাকা বাড়িতে বসবাস করে। অধিক সংখ (৫০.০০% ও ৪.১৬%) মহিলারা জানায় তাদের খাবার পানির উৎস হ টিউবওয়েল। উত্তরদাতা মহিলাদের ৪৭.৯২% ল্যাট্রিন সুবিধা ভোগ করে এ ১৬.৬৬% মহিলা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। জীবনযাত্রার মানের বর্তম অবস্থা দারিদ্র্যমুক্ত স্বচ্ছল জীবন কাঠামোর ইংগিত বহন করে না। উত্তরদাতাদে অধিকাংশই (৬৬.৬৭%) ভূমিহীন বা ১ বিঘার কম জমির মালিক। প্রকল্প-ঋণ তাদে জীবনধারণ কাঠামোয় তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। (সারনি-৯)

সারনি-১১: ঋণ-গ্রহিতাদের জীবন যাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান		**উত্তরদাতা**	
		গণসংখ্যা	**শতকরা (%)**
জমির মালিকানা	ভূমিহীন	১৮	১৮.৭৫
	১ বিঘার কম	৪৬	৪৭.৯২
	১-২ বিঘা	২৪	২৫.০০
	২-৩ বিঘা	০৬	৬.২৫
	৩-৪ বিঘা	০২	২.০৮
বাসগৃহ	কাঁচা	৭৪	৭৭.০৮
	আধাপাকা	১৪	১৪.৫৮
	পাকা	০৮	৮.৩৩
খাবার পানির উৎস	কুয়া	৪৪	৪৫.৮৩
	টিউবওয়েল (সাধারণ)	৫০	৫০.০০
	টিউবওয়ের (একক)	০২	৪.১৬
লেট্রিন	না	৩৪	৩৫.৪২
	হ্যাঁ	৪৬	৪৭.৯২
	মন্তব্য নেই	১৬	১৬.৬৬

পরিবারের মধ্যে পরিবর্তন:

সমিতির সাথে যুক্ত নারীদের সবার মত হচ্ছে, পূর্বে গৃহস্থালী কাজের বাইরে একত্রিত হয়ে আয়মূলক কোন কার্যক্রমের কথা তারা চিন্তা করতে পারতো না। প্রথমে সমিতিতে প্রবেশের সময় পরিবার থেকে বাধা আসলেও ঋণের টাকা হাতে আসার পর তা অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যায়। জনৈক মহিলা জানান যে পূর্বে প্রতিবেশী যারা তার সমিতিতে প্রবেশ নিয়ে হাসাহাসি করত, এখন তাদের ঘরের মেয়েরাই তার কাছে সমিতি সম্পর্কে জানতে আসে। নারীদের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে যে তাদেরও সংসারে কিছুটা অবদান আছে যা পূর্বে ছিল না। এখানে লক্ষণীয় যে, এ টাকার উপর নারীদের নিজেদের অধিকার খুবই স্বল্প কিংবা নেই বললেই হয়। তবুও তাদের বক্তব্য টাকা যার হাতেই থাকুক সবইতো সংসারের কাজেই ব্যয় হচ্ছে। নারীরা সংসারের কাজে ব্যয় বলতে বুঝায় সংসারের খাওয়া-দাওয়া, সন্তানের পড়াশুনা, অসুখবিসুখ, সংসারের কোন সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি।

"কাজ" সম্পর্কে নারীর ধারণা:

নারীদের 'কাজ' সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে- ঘরের কাজ কোন কাজ নয়। নারীদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় তারা কোন কাজ করে কিনা- প্রথমে সকলে একবাক্যে উত্তর দেয় কিছুই করে না। বাস্তবিকভাবে দেখা যায়, ঘরের কাজ, সন্তান-স্বামী পরিচর্যাসহ অবসর সময়ে কাঁথাসেলাই, শাকসব্জী, হাঁস-মুরগী পালন ও আরও নানাবিধ কাজ তারা করে থাকে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য। এসব কাজ নারীদের মধ্যে এমনভাবে আত্মস্থ হয়ে গেছে– এগুলোকে তারা তাদের জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মনে করে। এমনকি, তাদের সামান্য উপার্জনও তাদের হাতে আসে না, থাকে স্বামীর কাছে- যা নিয়ে তাদের কোন ক্ষোভ নেই।

নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতা:

পূর্বে পরিবারে কোন কাজের ক্ষেত্রে স্বামী এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতো, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করে থাকলেও মূল সিদ্ধান্ত স্বামীই গ্রহণ করে। ঋণের টাকা নেয়ার পর সেই টাকা ব্যবসায় লাগানো হবে, না ঘরের ছাউনী দিবে তা নিয়ে নারীরা কথা বলতে পারে। আগে তাদের ততটুকু কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। তবে তার পরিবারে কি পরিমাণ মর্যাদা বেড়েছে কিংবা তার কতটুকু স্বাধীন মতামত দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হচ্ছে এখনও যদি কোন ক্ষেত্রে একটু নিজের মতামত খাটাতে যাই তখনই শুনতে হয়

সমিতিতে গিয়ে এত উন্নতি হয়েছে- সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেই সব ঠিক হ যাবে। এখানে মূলত যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় তা হচ্ছে- ঋণ তথা টাকা বা সমিতি নার বাক স্বাধীনতা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা কিংবা কার্যকরি করার দ্বার সম্পূর্ণ উন্ করতে পারেনি।

পর্দা সম্পর্কে ধারণা:

সমিতিতে যাওয়ার পূর্বে পর্দা খুব কড়াকড়িভাবে মানা হতো, কিন্তু বর্তমানে সে অব শিথিল হয়েছে। তাদের সকলের মত হচ্ছে- তারা পর্দা মেনেই সব কাজ কে একজন উত্তরদাতা বলেন- 'গরীবের আবার পর্দা কি? কেউ তো আর খাওয়া দিব ন বস্তুত তাদের মতে পর্দা মানেই হচ্ছে ঘরের মধ্যে থাকা, পর- পুরুষের সামনে যাওয়া কিংবা তাদের সাথে একসঙ্গে কাজ না করা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, স্বামী পর্দা মেনে কাজ করতে। সেক্ষেত্রে শুধু শুধু ঘরে অশান্তি না করাই ভালো। সমিতি যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজে সিদ্ধান্ত নিলেও স্বামীর অনুমতি ছাড়া যাওয়া যায় না। স্ব অনুমতি না দিলে সমিতি করতেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে সবার মত হলো : 'স্ব অনুমতি না দিলে কিভাবে করবো? স্বামী যা বলে ভালোর জন্যই বলে। তার অনুম নিয়েই তো সব কিছু করা উচিত। চার জন উত্তরদাতা শুধু সরাসরি বলেছেন- তাে স্বামী এ রকম নয় যে তারা কিছু করতে চাইলে ' না' করবে।

নারী-শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা:

পূর্বের চেয়ে নারীরা শিক্ষার গুরুত্ব এখন অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পা অনেকে বলেন যে, লেখাপড়া জানা থাকলে এত অল্প বয়সে (১০-১২) তাদের বি হতো না। তারা মনে করে অন্তত ৮ম শ্রেণী থেকে এস,এস,সি পর্যন্ত মেয়ে পড়ানো উচিত। সমিতিতে আসার ফলে অনেক ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলাম করেছে, একটু হলেও আগের চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। তবে তাদের মধ্যে এ সাহসী মনোভাব কাজ করে এবং তারা এখন নিজেরা অন্যকে পরামর্শ দিতে পা এমনকি, নতুন কিছু করার চিন্তাভাবনা করতে পারে।

নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা:

স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা অধিকাংশ কাজ করে কুয়ার পা সাহায্যে। তবে খাওয়ার পানি টিউবওয়েল থেকে এনে খায়। প্রায় বাড়ীতেই শিশুগুলো ইচ্ছেমত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে,মাটি থেকে জিনিস তুলে খাচ্ছে। শিশু পরনে প্যান্ট নেই, কোমরে ঘন্টি অথবা তাবিজ। জিজ্ঞেস করে জানা যায়, খা বাতাস যাতে না লাগে সেজন্য তাবিজ বাঁধা রয়েছে। সাধারণ অসুখবিসুখে পানিপ

ঝাড়-ফুকের উপর আস্থা বেশি। বর্তমানে তারা বেশি অসুস্থ হলে এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যায়। নারীরা সহজে তাদের শারিরীক অসুস্থতার কথা কখনও প্রকাশ করতে রাজী নয়।

ধর্মীয় মনোভাব:

এদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু ঘরের বাইরে প্রায় প্রত্যেকেই বোরকা পড়ে বের হন। শরীয়ত, ধর্ম, স্বামীর বাধ্য থাকা- এসব কিছুই তাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে এলেও প্রত্যেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন এমন নয়। বস্তুত দেখা যায় যে, কিশোরী বা অবিবাহিত মেয়েদের বেলায় পর্দার বিষয় বা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বেশি মানতে হয়। তবে তাদের মধ্যে বাহ্যিক বা সামজিক চাপের মুখে ধর্মীয় মনোভাবই বেশি লক্ষণীয়।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে নারীর মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন:

সামগ্রীকভাবে বলা যায় যে, পরিবারের মধ্যে পরিবর্তনের বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষিতেই অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া সমাজের আরও বিভিন্ন বিষয়েও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

একক ও যৌথ পরিবার সম্পর্কে ধারণা:

উত্তরদাতা অধিকাংশই একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তবে যৌথ পরিবার সম্পর্কে তাদের মতামত হলো- এতে নিরাপত্ত বেশি থাকে। কেউ অসুস্থ হলে অথবা বিপদে আপদে একজনকে পাশে পাওয়া যায়। তাছাড়া কোন কোন বিষয়ে মুরুব্বীরা তাদের থেকে অনেক বেশি বোঝেন- কাজেই যে কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। একক পরিবারে আছে যারা তাদের মত হলো এতে সংসারে অনেক বেশি স্বচ্ছলতা ভোগ করা যায়। নিজের পরিবার ও সন্তানদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সবক্ষেত্রে মনযোগ দেয়া যায় বেশি। সকল ব্যাপারে মুরুব্বীদের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় না। অবশ্য একক পরিবার থেকেও শ্বশুরবাড়ীকে দেখতে হয়-অর্থাৎ আর্থিক সাহায্য করতে হয় এমন পরিবারও রয়েছে দুইটি। তারা নিজেদের মেয়েকে ছোট পরিবারে বিয়ে দিতে বেশি আগ্রহী যাতে মেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পার্কে ধারণা:

পরিবার পরকল্পনা বিষয়ে সবারই ধারণা রয়েছে। তবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আগে যে লজ্জা, সংকোচ ছিল অনেকাংশে তা কমে গেছে। এমন অনেক নারীই আছে যারা নিজ থেকে স্বামীকে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। সন্তানের টিকা নেয়ার ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি মা সচেতন।

তাদের মতে বড় সন্তানের সময় এতসব জানা ছিল না। ৯৬ জন উত্তদাতার মধ জনই শালদুধকে অস্বাস্থ্যকর ও রোগের বাহক বলে মনে করে। তাদের অল্প বিয়ে হয়েছে- তখন এসব কথা কেউ তাদের বলেনি। তবে বর্তমানে যার সন্তানের মা- তারা বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়ায়। আর কিছু বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারে শালদুধ বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এনজিও'র সদস্য হিসেবে এসব বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত ছিল যা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা

নারীর অধিকার, যৌতুক ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন:

নারী ও পুরুষ সমান অধিকার হওয়া উচিত বলে তারা মনে করে। কিন্তু একথাও "মেয়ে সন্তানের উপর ভরসা করা যায় না।" কারণ, মেয়েরা বিয়ের পর সংসার করবে। সেখানে তাদের মত করে তাকে চলতে হবে, বাবা মাকে দে করা কিংবা সাহায্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

যৌতুকের প্রসঙ্গে নারীরা যৌতুক দেয়ার অসমর্থতার কথা জানলেও তারাই বলে- "ছেলেরা আনে, মেয়েদের দিতে হয়।" আবার দেখা যায়, সবারই মত বিয়ে দিতে গেলে তো যৌতুক দিতেই হবে। একজন উত্তরদাতা বলেছে, যদি পাত্র পাওয়া যায়, তবে সাধ্যমত যৌতুক দিব। এটাকে তারা যৌতুক না বলে সাজিয়ে দিতে হবে বলে জানায় । এক্ষেত্রে যদিও বেশিরভাগ উত্তরদাতারই দেয়ার সামর্থ্য নেই।

পরিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি না তাদের কাছে পরিচিত নয়, তবে ব্যাপারগুলো কেউই ভালোমত জানে না বা পারে না। উত্তরদাতা বেশিরভাগই বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয়নি। কারণ হিসেবে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব এবং দ্বিতীয়ত কিছুটা সচেতনতা থাকলেও রেজি সাথে অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত বিধায় তা হয়নি। খাবার স্যালাইন প্রক্রিয় সঠিকভাবে বলতে না পারলেও এটা কি এবং কেন, কখন খাওয়াতে হয়- ত জানে। বেশিরভাগ নারী তার সংসারের কাজে স্বামীর সাহায্য চায় না। তবে বি ক্ষেত্রে স্বামী সাহায্য করলে ঘরের কর্ত্রীর যে সহায়তা হয় সেটা সবাই বো স্বীকার করে।

সুপারিশসমূহ:

প্রকল্পের সমুদয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। সেখানে শিক্ষা, পরিশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনকে উৎসাহিত করার নীতি যুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রকল্পগুলিতে ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রামের মহিলাদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র গৃহ-অভ্যন্তরে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। সেখানে এসব কারখানাগুলো শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের মতোই নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে ফলপ্রসূ পরিচালনায় বিভিন্নমুখী সমস্যা-যেমন নিম্ন পদমর্যাদা, অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সুবিধাদি, গতানুগতিক প্রশিক্ষণ, অযৌক্তিক কর্ম বিশ্লেষণ, অপর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনার সমাধান প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বিভিন্ন মহিলা গ্রুপের মধ্যে বণ্টন করে সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ করার কর্মসূচি রেখে প্রকল্প ডিজাইন করলে কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প প্রণয়ণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চ অনুশীলন এবং তৎসংগে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুশীলন করে টার্গেট গ্রুপের উপর উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব দক্ষতার সাথে নিরূপণের কৌশল স্থির করা প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম ও শহর এলাকায় মহিলাদের বিভিন্নমুখী পেশার উপর জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের জন্য তথ্য সেন্টার বা লাইব্রেরী স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী- উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংগঠনগুলো দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে মহিলাদের দক্ষতা অনুসারে বিভক্ত করে একেকটি দল গঠন করা যেতে পারে। এতে করে প্রকল্প কার্যক্রমে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমাবেশ করার ক্ষেত্রে শ্রম, সময় ও ব্যয়- সবই সংকুচিত হবে।

সুপারিশসমূহ:

প্রকল্পের সমুদয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। সেখানে শিক্ষা, পরিশক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনকে উৎসাহিত করার নীতি যুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রকল্পগুলিতে ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রামের মহিলাদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র গৃহ-অভ্যন্তরে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। সেখানে এসব কারখানাগুলো শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের মতোই নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে ফলপ্রসূ পরিচালনায় বিভিন্নমুখী সমস্যা-যেমন নিম্ন পদমর্যাদা, অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সুবিধাদি, গতানুগতিক প্রশিক্ষণ, অযৌক্তিক কর্ম বিশ্লেষণ, অপর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনার সমাধান প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বিভিন্ন মহিলা গ্রুপের মধ্যে বণ্টন করে সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ করার কর্মসূচি রেখে প্রকল্প ডিজাইন করলে কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প প্রণয়ণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চ অনুশীলন এবং তৎসংগে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুশীলন করে টার্গেট গ্রুপের উপর উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব দক্ষতার সাথে নিরূপণের কৌশল স্থির করা প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম ও শহর এলাকায় মহিলাদের বিভিন্নমুখী পেশার উপর জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের জন্য তথ্য সেন্টার বা লাইব্রেরী স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী- উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংগঠনগুলো দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে মহিলাদের দক্ষতা অনুসারে বিভক্ত করে একেকটি দল গঠন করা যেতে পারে। এতে করে প্রকল্প কার্যক্রমে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমাবেশ করার ক্ষেত্রে শ্রম, সময় ও ব্যয়- সবই সংকুচিত হবে।

প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্প-ঋণের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাঠ প অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সদস্যদের প্রকল্প ঋণ যে কাজে হয়েছে তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধ ক তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে। ফলে, মহিলারা উপার্জনমুখী কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় ।

প্রকল্পের আওতায় অনাদায়ী ঋণ আদায় করে তা পুনরায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহি মধ্যে বিতরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে gweA-কে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা ঋণ-সুবিধা না পাবার কারণে লব্ধ দক্ষতা লাগতে পারছে না তাদের ঋণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়ে

দারিদ্র্য বিমোচন, কিংবা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের কর্মসংস্থান কিংবা উৎপাদনক্ষম জনসম্পদ হিসেবে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে অভিপ্রায়ে জিও-এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্পগুলি সর্বাংশে উৎপাদনশীল স্বনির্ভর জনসম্পদে পরিণত করতে বরাবরই ব্যর্থ হচ্ছে। ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যগোষ্ঠীকে উপার্জনক্ষম জনসম্পদে পরিণত অভিজ্ঞতা দৃষ্টিগোচর হয় না বললেই চলে। সুতরাং জনশক্তি উন্ন প্রয়োজনেই ঋণ প্রকল্পের ধারণা, প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আবশ্যক।

উপসংহার:

সার্বিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে আগের তু অনেক বেশি সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অনেকেই পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য যি আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। ত দারিদ্রের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যই এ সকল ঋণগ্রহীতা নারীদের পরিবারে বিদ্য ঋণগ্রহীতা এ সকল মহিলা যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে তা প্রাপ্ত তথ্য অনুমেয়। সঞ্চয়, ঋণদান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি সাফল্যজনক উদ্যোগ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। যথার্থ প্রশিক্ষণের অভাব, বিশেষায়িত পেশায় মহিলাদের অপর্যাপ্ত দ বর্তমান ঋণের পরিমাণ এবং তা বরাদ্দ করার ও পরিশোধের উপায়, স্বল্প বিনি এবং অপ্রতুল উদ্বৃত্ত- এসবই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির উপর নেতি প্রভাব ফেলছে। দেশীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে দারিদ্র্য হয়তো সমূলে উৎ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সহনশীল ও গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মসূচি, প্রশাসনিক স্ব ও জবাবদিহি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের দৃঢ় অঙ্গীকার চরম দারিদ্র্যে কাঠি খানিকটা হলেও তরল করতে পারে এবং নারীর উন্নয়নকে তরান্বিত করতে পারে

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Sharmin Hamid, Why Women Count , Dhaka ,1993

Jahanara Haq, History of Development Effort in Bangladesh, Women for women, p.03).

The Daily Independent, Dhaka, 27th July, 2002).

R.K. Sapru; Development Administration, Sterling Publishers Limited, New Delhi).

R.K. Sapru; Development Administration, Sterling Publishers Limited, New Delhi).

ড. শওকত আরা হোসেন, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন; দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৭, ২০০২)